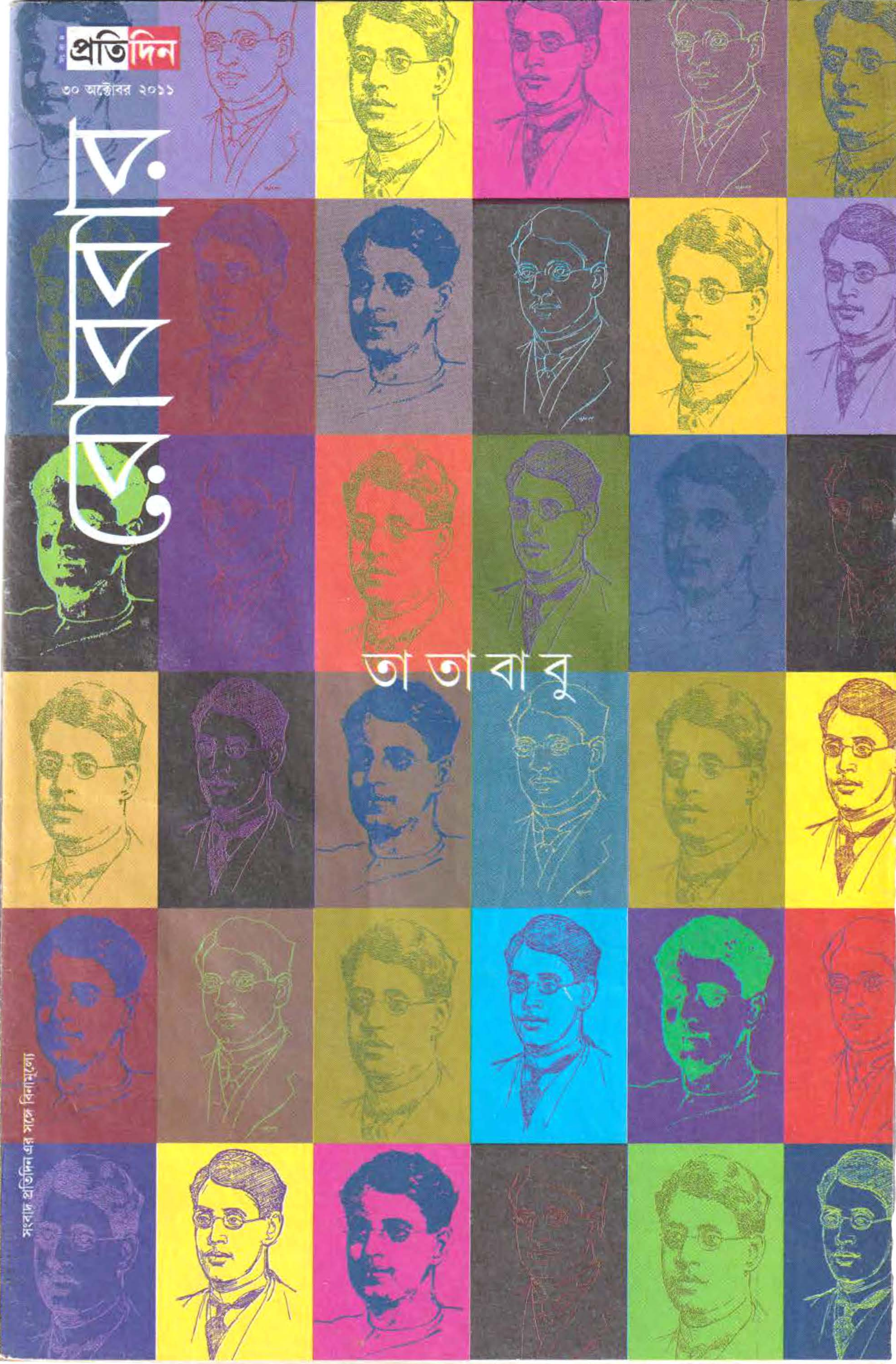
প্রতিদিন

৩০ অক্টোবর ২০১১

রবিবার



তাতাবাবু

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

স্ক্যান করেছেন : রূপালী গোসাভি

হার্ড কপি ও এডিট করেছেন : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।



গোল্ড কালেকশন
উপহার কেনা আর সময়সাপেক্ষ নয়।
Gifty
GIFT VOUCHER
যেকোনো মূল্যের পাওয়া যায়। সবরকম গয়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
যোগাযোগ করুন স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে।
অঞ্জলি জুয়েলার্স®
সবার জন্য
www.anjali.bz
মাসে মাসে ১০০, ২৫০, ৫০০, ১০০০ টাকা
বা তার বেশীর কিস্তিতে ধাপে ধাপে টাকা জমান।
১২ মাস টাকা জমালে
১ মাস ফ্রি !!*
গোলপার্ক - ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ১৭৯২ | শোভাবাজার - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪ | সল্টলেক বি.ই. - ২৩২১ ২৭৮৬
সল্টলেক এইচ.এ. - ২৩২১ ৮৩১০/১১ | বেহালা - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ | হাওড়া পঞ্চাননতলা - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১
বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ | শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ০৩৫৩২-৬৪৩৩৩৫
বৌবাজার - ১২৪ ও ১২৪/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২ | এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।
Mayurakshi/741/11

প্রতিদিন

৩০ অক্টোবর ২০১১

রোববার

সৌজন্য : সন্দীপ রায়

প্রচ্ছদ : শান্তনু দে

রোববার-এর নতুন ওয়েব ঠিকানা
রোববার
www.ezinemart.com

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী,
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার, শান্তনু দে, সুপ্রিয় দাস
সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

ঋতুপর্ণ ঘোষ

রেড ওয়াইন-এর স্বাদ প্রথম পেয়েছিলাম লোকার্নো-য়। সঙ্গে সেবার ছিলেন জয়াদি (বচ্চন), যিনি, অনেকেই জানেন না, একজন উঁচু মানের ওয়াইন-বিশারদ। বোতলের নাম দেখেই জাত বলে দেবেন।



ইদানীং আমার কিঞ্চিৎ মদিরাসক্তি হচ্ছে, মনে হয়

দূর পাল্লার প্লেন-এ উঠলে সেটা আরও বেশি করে বুঝতে পারি। প্লেন ছাড়লেই বিমানসেবিকারা নানাবিধ পানীয় পরিবেশন করেন আর আমি পূর্বে অবধারিত ভাবে হয় ডায়েট কোক বা টোম্যাটো জুস-এর দিকে হাত বাড়াতাম।

সাম্প্রতিক কয়েকটা যাত্রায় দেখলাম, একটু সময় নিয়ে বলছি—রেড ওয়াইন।

Bailey's-এর Irish Cream-টা আমার বড় প্রিয়। কিন্তু ওটা একেবারে মিষ্টি গুড়ের মতো। আমার মতো ডায়াবেটিস রোগীর পক্ষে প্রায় বিষ। তার থেকে বরং রেড ওয়াইন-টা মন্দ নয়।

আসলে প্রায় অর্ধশতাব্দী মদিরাবর্জিত জীবন পালন করে আমার একটা অসুবিধে আছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে 'ভাল মদ' নিয়ে যখন আলোচনা হয়, ভ্যাবলার মতো চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। আমার মদবিষয়ে কোনও তিক্ত অভিজ্ঞতা, বা নীতিবাগীশতার জায়গা থেকে যে নয়, বাকি পৃথিবীকে বোঝাতে এটা আমার বেশ সময় লেগেছিল।

আমার আসলে অ্যালকোহলে একটা অ্যালার্জি আছে, গলা দিয়ে এক ঢোক নামলেই গলা চুলকোয়। আমি নিজেও এটা বুঝেছি অনেক দেরিতে।

কলেজবেলায় বন্ধুরা জোর করে মদ খাওয়ানোর ঝোঁকে লুকিয়ে Thums Up-এর সঙ্গে দু ছিপি রাম ঢেলে দিত। আমি নিষ্পাপ মনে দু'টো চুমুক মেরেই মুখটা বিকৃত করে গেলাসটা নামিয়ে রাখতাম—

—অ্যাই, তোরা এই Thums Up-টা খাস না। এটা বোধহয় Spurious, আমার কেমন গলা জ্বালা করছে।

দু-একবার এইরকম ঘটার পর, ধীরে-ধীরে বন্ধুরাও বুঝে গেল যে, আমাকে এইভাবে র‍্যাগ করে কোনও লাভ নেই।

পরবর্তী কালে, আমার চলচ্চিত্রকার পেশার বিভিন্ন বিদেশ সফরেও, নিজেকে ভীষণ যত্ন করে মদিরা-বিচ্যুত রাখতে হয়েছে।

রেড ওয়াইন-এর স্বাদ প্রথম পেয়েছিলাম লোকার্নো-র সঙ্গে। সেটা আমার দ্বিতীয়বার লোকার্নো চলচ্চিত্রোৎসবে যোগদান। 'অন্তরমহল' ছবিটি 'এ বি কর্প'-এর প্রযোজনা, ফলে জয়াদি (বচ্চন) গিয়েছিলেন প্রযোজনা-প্রতিভূ হয়ে।

অনেকেই জানেন না, জয়াদি একজন উঁচু মানের ওয়াইন-বিশারদ। এবং বছর কয়েক আগে মুম্বইয়ের বন্যার সময়, বাড়িতে জল ঢুকে ওঁদের সযত্নসঞ্চিত প্রায় হাজারখানেক ওয়াইন বোতল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এহেন জয়াদি বোতলের নাম দেখেই ওয়াইনের জাত চেনেন। এবং আমরা লোকার্নো-র, পড়ে-আসা সন্ধেগুলোয় নানা পথের ধারের রেস্তোরাঁ বা ছোট কাফে-তে রুটি আর ওয়াইন খেতে-খেতে প্রচুর আড্ডা মারতাম। ধীরে-ধীরে রোদ পড়ে আসত, বেগুনি হয়ে উঠত দূরের আকাশ। রেস্তোরাঁর কর্মী এসে বাতি রেখে যেতেন টেবিলে, আর রূপা (গঙ্গোপাধ্যায়) থেকে-থেকেই উঠে যেত, একটু দূরে গিয়ে জয়াদি-র থেকে লুকিয়ে সিগারেট খাবে বলে।

লাল ওয়াইন-এও যে প্রথম-প্রথম অস্বস্তি হয়নি, তা বলব না। তবু সেটা তেমন প্রকট নয়। এখন, কোনও মদের আড্ডায় প্রবল চাপাচাপি এলে, ছোট একটা ওয়াইন নিয়ে সহজে গৃহস্থের অনুরোধ রক্ষা করতে পারি।

প্লেনে উঠেও দেখেছি একটা বা দু'টো কম পরিমাণ ওয়াইন খেয়ে নিয়ে রাতের খাবারটা খেলে ঘুমটা ভাল হয়। শুধু-শুধু ঘুমের ওষুধ খেতে হয় না।

দুবাই থেকে মাদ্রিদ প্রায় সাত ঘণ্টার ফ্লাইট। ওয়াইন আর ব্রেকফাস্ট-এর পর ক্রমশ যখন প্লেনের আলো স্তিমিত হয়ে এল, আশেপাশের যাত্রীরা অধিকাংশই ঘুমিয়ে, বা টিভি দেখতে ব্যস্ত—আমি জানলাটা নামিয়ে নিয়ে কম্বলটা টেনে নিলাম।

২

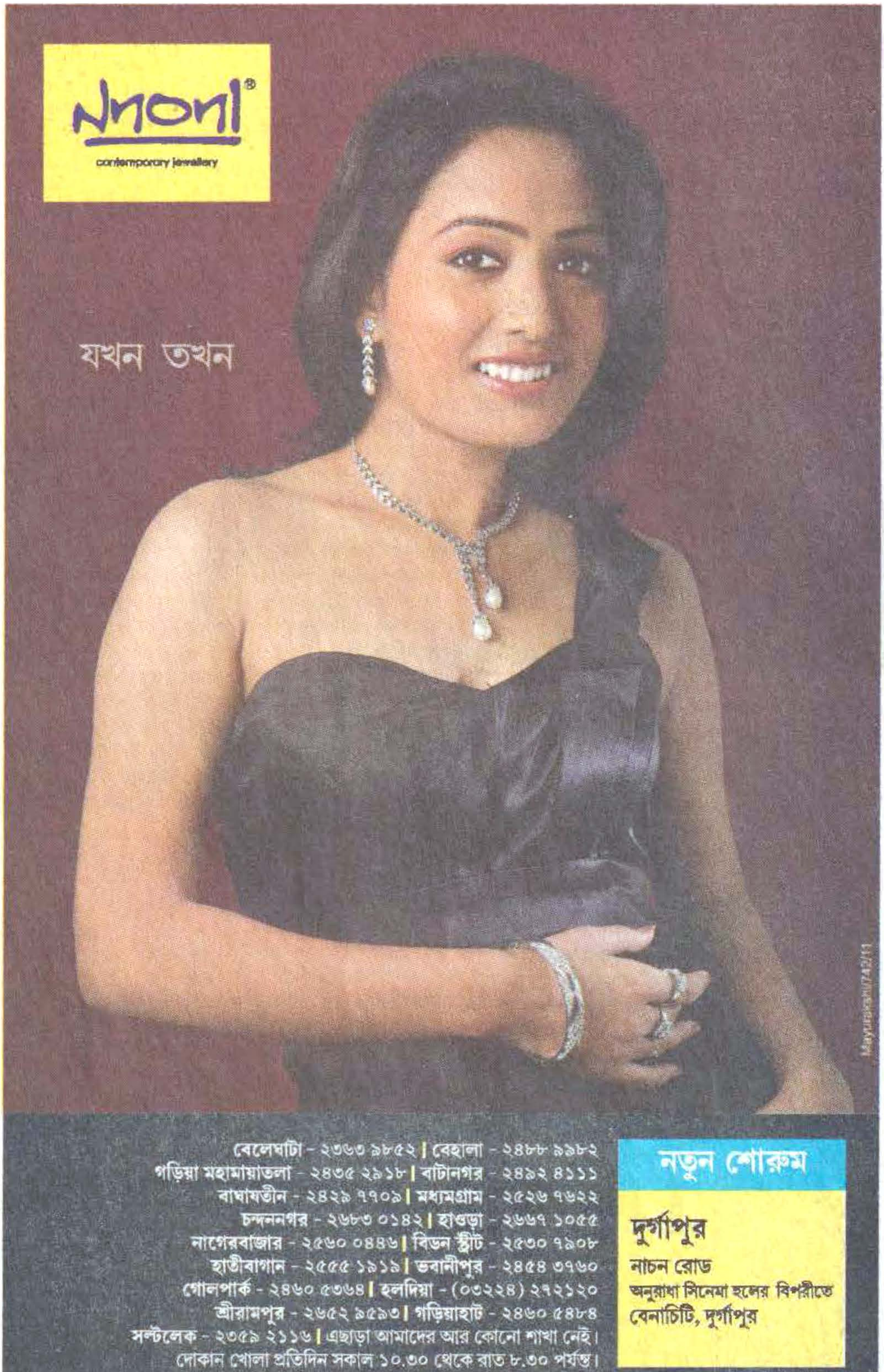
মাদ্রিদ-এ পৌঁছনোর ঘোষণা যখন হচ্ছে, তখন মাদ্রিদের সময় বেলা একটা, দেশের ঘড়ি সময় দেখাচ্ছে সাড়ে চারটে। ধীরে-ধীরে চশমা, বই, খবরের কাগজ গুছিয়ে নিতে-নিতে হাতঘড়ির সময় বদল করলাম। জানি কব্জি থেকে খসে গেলেও, হাতের মুঠোফোনে অদলবদল করবে দেশের সময়।

তখনও জানি না, ব্ল্যাকবেরি ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে আপনিই নিজের সময় পাল্টে নেয়।

মনে-মনে হাসলাম, সময়কে পাকড়ে রাখার এত যে চেষ্টা, সে তো সালভাদোর দালি-র দেশে পা রাখার আগেই বিগলিত হয়ে গড়িয়ে পড়ারই কথা।

আমাদের প্লেন থামল—টার্মিনাল ফোর স্যাটেলাইট-এ। আমাকে এখান থেকে অভ্যন্তরীণ টিউব ট্রেনে পৌঁছতে হবে টার্মিনাল ফোর-এ। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলল। দরজা যখন খুলল, নামতে-নামতে দেখি, সামনে দেওয়াল-জোড়া একটা ম্যুরাল হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পাবলো পিকাসো। সবার তখন ইমিগ্রেশন-এ ছোটার তাড়া। একটু কাছে গিয়ে পিকাসো-টা দেখছি। পাশে কেউ এসে ধীর পায়ে দাঁড়ালেন দু'জন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, বাবা আর মা। ইমিগ্রেশন চুলোয় গেল। তিনজনে মিলে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলাম পিকাসো-র দিকে।

(ক্রমশ)



nnoni®
contemporary jewellery
যখন তখন
বেলেঘাটা - ২৩৬৩ ৯৮৫২ | বেহালা - ২৪৮৮ ৯৯৮২
গড়িয়া মহামায়াতলা - ২৪৩৫ ২৯১৮ | বাটানগর - ২৪৯২ ৪১১১
বাঘাযতীন - ২৪২৯ ৭৭০৯ | মধ্যমগ্রাম - ২৫২৬ ৭৬২২
চন্দননগর - ২৬৮৩ ০১৪২ | হাওড়া - ২৬৬৭ ১০৫৫
নাগেরবাজার - ২৫৬০ ০৪৪৬ | বিডন স্ট্রীট - ২৫৩০ ৭৯০৮
হাতীবাগান - ২৫৫৫ ১৯১৯ | ভবানীপুর - ২৪৫৪ ৩৭৬০
গোলপার্ক - ২৪৬০ ৫৩৬৪ | হলদিয়া - (০৩২২৪) ২৭২১২০
শ্রীরামপুর - ২৬৫২ ৯৫৯৩ | গড়িয়াহাট - ২৪৬০ ৫৪৮৪
সল্টলেক - ২৩৫৯ ২১১৬ | এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।
দোকান খোলা প্রতিদিন সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত।
নতুন শোরুম
দুর্গাপুর
নাচন রোড
অনুরাধা সিনেমা হলের বিপরীতে
বেনাচিটি, দুর্গাপুর
Silver | Pearl | Costume
An Anjali Jewellers Initiative | customercare@nnoni.in | www.nnoni.in

 রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ষাটের দশকে প্রথম পড়েছিলাম 'আ রুম অফ ওয়ান্'স ওন'। পাতায়-পাতায় চমক। বুঝেছিলাম—কেন জেন অস্টেন বা শার্লট ব্রন্টি-র পক্ষে কখনওই লেখা সম্ভব হত না 'ওয়র অ্যান্ড পিস'!



ম,
আমি এতবার ঠিকানা পাল্টেছি, পুরনো ঘর ছেড়ে গিয়েছি নতুন ঘরে, নব পরিবেশে, এতবার হারিয়েছি বন্ধ-বারান্দা, এতবার পেয়েছি নতুন বারান্দায়, ছাদের, জানলার প্রতিশ্রুতি, মনে হয়েছে ফেলে আসা ঘরটির জন্য কষ্টই থাক না কেমন, নতুন ঘরটিকে আবিষ্কারের আহ্লাদ, গ্রহণ করার আনন্দের কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে যায় সেই মেদুরতার ব্যথা।

ঘর বদলানোর আনন্দ ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রিয় আনন্দের একটি। এক বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে, একেবারেই অন্যরকম বাড়িতে, গিয়েছেন তিনি বারবার। কখনও আবার থেকেছেন একই ঘরে, কিন্তু আমূল বদলে দিয়েছেন ঘরটির চাউনিবিন্যাস—আসবাবে যুক্ত হয়েছে নতুন ভঙ্গি, আসবাবের স্থানবদলের সঙ্গে বদলেছে ঘরের মেজাজ, দিনরাতের ছোট-ছোট আমেজ, প্রেমের অনুভব। যখনই কোনও নতুন বাড়িতে যেতেন রবীন্দ্রনাথ, বলতেন, এবার থেকে আমি এখানেই থাকব, এই বাড়িটাই আমার পক্ষে ঠিক হয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার উসখুস করতেন অন্য বাড়ির জন্য। 'কোনার্ক' বাড়িটি তৈরি করলেন খুব শখ করে—তাঁর লেখার ঘর, ভাবনার ঘর যেন এমন হয় যে সেখান থেকে চারিদিকের দিগন্ত অবধি পরিষ্কার দেখতে পান। 'কোনার্ক'-এর লাগোয়া তৈরি হল এই ঘর। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রের রোমান্টিক মন চাইল পরিবর্তন—লেখার টেবিল তুলে নিলেন খাবার ঘরে। বসতেন আলোর দিকে মুখ করে। দু'বার বসলেন পিঠের ওপর আলো নিয়ে। পশ্চিমের ঘরটাকে করলেন খোলা বারান্দা। পুবের বারান্দা বন্ধ হল। কারণ পশ্চিমের বারান্দাই তো ভাল। কিন্তু তাতেও মন উঠল না—রবীন্দ্রনাথের চাই মাটির বাড়ি। তৈরি হল 'শ্যামলী'। বললেন, এই হল আমার শেষ বাড়ি:

সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত,
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি
সব কলঙ্কের মার্জনা।

ম, শেষ বাড়ির পর আরও একটি বাড়ি হল রবীন্দ্রনাথের—নাম দিলেন 'পুনশ্চ'। 'পুনশ্চ' শ্যামলীর পুবে, কয়েক হাতের মধ্যেই। 'পুনশ্চ'-র ভাবনার ঘরটিকে প্রথম-প্রথম বেশ লাগল রবি ঠাকুরের, কিন্তু কিছুদিন পরেই বললেন, এ কী! আমি কি এই চেয়েছিলুম? 'পুনশ্চ'-র পুবদিকে তৈরি হল তাঁর নতুন বাড়ি 'সেঁজুতি'। তখন যে তাঁর ভাবনায় তাঁর নতুন বই 'সেঁজুতি'। কিছুদিনের মধ্যেই আবার বদল চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। এবার আর বাড়ি বানালেন না। পাল্টে দিলেন 'সেঁজুতি'-র পরিচয়। আর 'সেঁজুতি' বাড়ির নতুন নাম রাখলেন রবীন্দ্রনাথ—'উদীচী', পুবদিকের বাড়ি তো, তাই ওই নাম।

ম, পুরনো প্রেম, পুরনো ঠিকানা, পুরনো ভাবনা বারবার বদলেছেন রবীন্দ্রনাথ—এই পরিবর্তনের একদিকে মেদুর বেদনা, অন্যদিকে নতুনকে পাওয়ার, চেনার, আবিষ্কারের পুলক—রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মন পেয়েছে প্রেরণা এই উভয়বলতায়। ভার্জিনিয়া উল্ফ যাকে বলেছেন 'আ রুম অফ ওয়ান্'স ওন', নিজস্ব একটি ভাবনার ঘর, যার ওপর এক সময়ে শুধু পুরুষেরই ছিল অধিকার—এমন ঘর ছিল নারীর নাগালের বাইরে—ম, প্রশ্ন হল, সত্যিই কি এমন ঘর পাওয়া সহজ, কি পুরুষ, কি নারীর পক্ষে? কলকাতা তো বাড়িবন্যায় ভেসে যাওয়া একটি শহর—কিছু কিছু বাড়ির অন্দরমহলে কী অবিশ্বাস্য প্রাচুর্য আর বৈভব! কিন্তু কী অন্তঃশূন্য এইসব বাড়ি—এ-বাড়িতে যাঁরা থাকেন তাঁদের কেউই তো চাননি ভাবনার একটি নিজস্ব ঘর!

ম, তোমার ছেড়ে-আসা বাড়ির ওই যে লম্বা আলো-আঁধারি ঘরটি, যার দেওয়াল থেকে উপচে নামত বইয়ের স্রোত, বুককেসগুলো আঁকাবাঁকা ঢেউয়ের মতো যেন মাধ্যাকর্ষণকে অবজ্ঞা করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল,

সেইখানে আলতো আলোর আভাসে, তুমি বসে হেলানচেয়ারে, যেন মমশিখার মতো মনে হয়েছে আমার তোমাকে যখনই ঢুকেছি ওই ঘরে, বসেছি তোমার পায়ের কাছে—ম, যখনই এমন হয়েছে, আমার মনে হয়েছে তোমার এই ঘরটি তোমার-আমার মনের ঘর, যে-ঘরে বইছে ভাবনার বাতাস, যে-ঘরের দেওয়াল থেকে নামছে ভাবনার স্রোত, যে-ঘরে আলো-আঁধার আমাদেরই ব্যক্তিগত প্রত্যয়-সংশয়ের পারস্পরিক বুনন। ম, তোমার নতুন বাড়িতে হয়তো এমন কোনও ঘর নেই—কিন্তু তোমার মন, তোমার বিশ্বাস-সংশয়, তোমার আনন্দ-বিষণ্ণতা ঠিক তৈরি করে নেবে ঘরের মধ্যে ঘর—তোমার নিজস্ব নিলয়। অনেক বছর পরে ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর 'আ রুম অফ ওয়ান্'স ওন'-এর কাছে ফিরে এসে এসব কথা এলোমেলোভাবে মনে হল আমার। আগে যখন পড়েছিলাম তখন হয়তো এইভাবে মনে হয়নি। এখন হচ্ছে। বইটিকে নতুনভাবে ফিরে পাচ্ছি—তাই।

১৯২৮ সাল। ভার্জিনিয়া উল্ফ-কে আমন্ত্রণ জানাল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজ। কীসের আমন্ত্রণ? একটি ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ। বিষয় 'উইমেন অ্যান্ড ফিকশন', নারী ও উপন্যাস। ভার্জিনিয়া উল্ফ ভাষণ দিলেন, 'নিজস্ব একটি ঘর' সেই ভাষণের মূল বিষয়!

তাঁর ভাষণ শুরু হয়েছিল এইভাবে—শুরুই 'কিন্তু' দিয়ে!

'But, you may say, we asked you to speak
about women and fiction—what has that
got to do with a room of one's own?'

ভার্জিনিয়া উল্ফ ব্যাখ্যা করে বোঝালেন 'নারী ও উপন্যাস' এই বিষয়টির সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে আছে নিজস্ব একটি ঘরের বিষয়টি। এতই ওতপ্রোত তাদের সম্পর্ক যে, একটিকে অন্যটি ছাড়া ভাবাই যায় না।

ম, ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর লেখা, তাঁর গদ্যভঙ্গি, তাঁর শব্দচয়ন, তাঁর ভাবনাবিন্যাস, তাঁর বিপুল বৈদগ্ধ্যের উচ্চারণ, তাঁর পণ্ডিতিবিহীন সাবলীল মৌলিকতা—এসব আমাকে গ্রাস করে আছে যৌবন থেকে। কী আপাত-সহজতা তাঁর গদ্যে! অথচ ওই পাটেপাটে সহজতার মধ্যে লুকিয়ে আছে কী শ্রান্তিহীন শ্রম! তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য ভয়েজ আউট' পড়ে মনে হয়েছিল, আত্মপ্রকাশের লেখাই এমন অনন্য! কী করে সম্ভব এমন অবিকল্প গদ্য প্রথম উপন্যাসেই। আর যখন পড়লাম তাঁর 'টু দা লাইটহাউস', মনে হল সমুদ্রের মতোই অতল তাঁর লেখা—রাতের সমুদ্র, জ্বলে-জ্বলে উঠছে তাঁর মননের আলোয়। ষাটের দশকে, তখনও ছাত্র, প্রথম পড়েছিলাম 'আ রুম অফ ওয়ান্'স ওন'। পাতায়-পাতায় চমক—লাইনে-লাইনে মুগ্ধ হতে-হতে এগিয়েছিলাম। বইটি বন্ধ করে আমাদের শ্যামপুকুর লেনের চিলেকোঠার ঘরের জানলার বাইরে চুপ করে তাকিয়েছিলাম ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর এই প্রশ্নটির সামনে—কেন জেন অস্টেন বা শার্লট ব্রন্টি-র পক্ষে কখনওই লেখা সম্ভব হত না 'ওয়র অ্যান্ড পিস'? এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভার্জিনিয়া। সেই মৌলিক ভাবনার মধ্যেই নিহিত 'আ রুম অফ ওয়ান্'স ওন'-এর অন্তরবার্তা।

ম, ভাষণের শুরুতেই ভার্জিনিয়া উল্ফ বললেন, 'আপনারা আমাকে ডেকেছেন 'নারী ও উপন্যাস' নিয়ে কিছু বলার জন্য। বিষয়টি নিয়ে একটু ভেবে দেখার জন্যে আমি একটি নদীর তীরে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। বসে থাকতে-থাকতে এই বিশেষ বিষয়টির অনেকগুলো পরত ধীরে-ধীরে খুলতে লাগল আমার ভাবনার মধ্যে। আমি কেবল মাত্র ফ্যানি বার্নি, জেন অস্টেন, ব্রন্টি-ভগ্নিদ্বয়, জর্জ এলিয়ট এইসব উপন্যাস-লেখিকাদের নিয়ে একটা বক্তৃতা খাড়া করতে পারি। কিন্তু উইমেন অ্যান্ড ফিকশন-এর অন্য অর্থও তো হতে পারে—উপন্যাসে নারীরা কেমন—এটাও তো হতে পারে আমার ভাষণের বিষয়। অথবা নারী এবং সেই নারীর লেখা উপন্যাস—এভাবেও ভাবা যায়। কিংবা নারীর বিষয়ে লেখা উপন্যাস—তাও তো হতে পারে আমার আলোচনার বিষয়। হয়তো বা সবগুলো বিষয়ই পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং আপনারা হয়তো চান আমি সেইভাবেই বিষয়টাকে দেখি। কিন্তু তার একটা মারাত্মক অসুবিধে আছে—অসুবিধেটা হল, আমি কিছুতেই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব না।

'But when I began to consider the subject in this last way, which seemed the most interesting, I soon saw that it had one fatal drawback. I should never be able to come to a conclusion. I should never be able to fulfil what is, I understand, the first duty of a lecturer—to hand you after and hour's discourse a nugget of pure truth to wrap up beetween the pages of your notebooks and keep on the mantelpiece for ever.'

ম, কী চমৎকার লেখা বলো তো! এক দলা বিশুদ্ধ সত্য! আহা কেন এমন লিখতে পারি না? 'যিনি ভাষণ দিচ্ছেন তাঁর প্রধান দায়িত্ব হল ঘণ্টাখানেকের ভাষণের মাধ্যমে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া এক দলা নিখাদ সত্য—যে-দলাটিকে আপনারা আপনাদের নোটবুকে সযত্নে মুড়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে আপনাদের ঘরে আঁচ-পোয়াবার আগুনের ওপরের তাকটিতে চিরকালের জন্যে রেখে দিতে পারবেন!' এক কথায়, ব্রিলিয়ান্ট! আছে মৃদু শ্লেষ—মধ্যমেধার প্রতি। আছে তথাকথিত 'সত্য'-সিদ্ধান্তের প্রতি কটাক্ষ। আছে ব্রিটিশ হিউমারের ঝলক। আর আছে একটি তির্যক ব্যঞ্জনা—অগ্নিকুণ্ডের ওই আঁচ কি নয় ভাবনার তাপ? যার বড় প্রয়োজন আমাদের নিজস্ব ঘরটির মধ্যে—সে-ঘরে আর কোনও কিছুর যেন প্রয়োজন নেই। এরপরেই এতটুকু সময় নষ্ট না-করে, প্রায় এক নিশ্বাসে বিষয়ে চলে এলেন ভার্জিনিয়া, মারলেন পেরেকের মাথায় হাতুড়ি!

All I could do was to offer you an opinion upon oue minor point (নিশ্চয় ভার্জিনিয়া সামান্য থেমে ছিলেন এখানে, তাঁর ঠোঁটে ঝিলিয়ে গিয়েছিল বিদ্রুপের হাসি)—a woman must have money and room of her own if she is to write fiction.

'One 'minor' point—আমার মতামত জানাতে পারতাম বিষয়ীভূত একটি নিতান্ত 'নগণ্য' অঙ্গ-প্রসঙ্গে। নিতান্ত 'তুচ্ছ' বা 'নগণ্য' পয়েন্ট! যে-পয়েন্ট বা বিষয়ের যে-অঙ্গটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? আবার ভার্জিনিয়ার কণ্ঠে ফুটে উঠেছে শ্লেষ—আপনারা আমাকে ডেকেছেন 'নারী ও উপন্যাস' নিয়ে বলতে, অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকেই আড়াল করে রেখেছেন! সে-বিষয় তো নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তার ভাবনার স্বাধীনতা, তার নিজস্ব একটি ঘর যে-ঘরে তার খুশিমতো একা হওয়ার অধিকার তার আছে। ম, ১৯২৮ সালে এই কথাগুলির অপরিসীম গুরুত্ব নিশ্চয় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। ম, বলা হয়েছে 'আ রুম অফ ওয়ান্'স ওন'-এর মধ্যে 'Virgina Woolf gives us one of the greatest feminist polemics of the century.' নারীমুক্তির জন্যে এমন শানানো দৃপ্ত সওয়াল, 'নারী ও উপন্যাস' বিষয়ে বলতে গিয়ে—আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হই। ভার্জিনিয়া এতটুকু গলা উঁচু না-করে, কী মৃদুভাবে বললেন—a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. তারপর বললেন, সেইজন্যই তো নারীর সত্য-স্বভাব এবং উপন্যাসের সত্য-চরিত্র, এই দুই সমস্যার কোনও সমাধান হল না আজও : 'and that, as you will see, leaves the great problem of the true nature of woman and the true nature of fiction unsolved.'

ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর বক্তব্যের মৌলিকতা এবং জোর কিন্তু উঠে আসছে তাঁর এই চর্চিত, সচেতন মৃদুভাষিতা থেকেই। ম, নিজের ঘর বলতে যা বোঝায়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং পৃথিবীর একটি ঘরকে অন্তত নিজের বলে চিহ্নিত করার অধিকার—নারীর এই অর্জনটুকু একেবারেই সাম্প্রতিক। তাও ওদেশে। এদেশে ক'জন মেয়ের নিজের ঘর আছে বলো? বাপের বাড়িতে যদি বা

তা জোটে. বিয়ের পরে তো স্বামীর সঙ্গে ঘর ভাগ করে নিতে বাধ্য হয় নারী। যদি কোনও গৃহবধূ চেয়ে বসে বা তৈরি করার চেষ্টা করে তার নিজস্ব একটি ভাবনার ঘর! তা হলে হয়তো তথাকথিত সুখের সংসারটাই যাবে চুরমার হয়ে—সেই অনাচার গেরস্ত বাড়িতে চলতে পারে? ম, সাধারণ বাঙালি সংসারের এই ভয়াবহ প্রেক্ষিতের কথা মনে রাখলে এক বিরল সৌভাগ্যে তুমি অর্জন করেছ তোমার একাকিত্ব, তোমার নিজস্ব ঘর, যে-ঘর জড়িয়ে আছে তোমার একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ-বিষাদের সঙ্গে, স্মৃতি-সত্তার সঙ্গে, তোমার ভাবনাভুবনের সঙ্গে, তোমার আত্মপ্রেমের সঙ্গে, তোমার মগ্নতার সঙ্গে।

ম, তোমার সৌভাগ্যের কণাটুকুও ছিল না শেক্সপিয়র-এর বোনের—অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী সে, দাদার চেয়ে কিছু কম নয়, কিন্তু তার না হল লেখাপড়া, না হল নিজের এক টুকরো ঘর! শেক্সপিয়র-এর বোন? কোথা থেকে আবার সে এল?

ম, তাকে নিয়ে এসেছেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ। তার নাম রেখেছেন জুডিথ :

'Let me imagine, since facts are so hard to come by, what would have happened had Shakespeare had a wonderfully gifted sister, called Judith, let us say. Shakespeare himself went, very probably, to the grammar school, where he may have learnt Latin—Ovid, Virgil and Horace—and the elements of grammar and logic. He was a wild boy who poached rabbits, perhaps shot a deer, and had rather sooner than he should have done, to marry a woman in the neighbourhood, who bore him a child rather quicker than was right. That escapade sent him to seek his fortune in London. He had, it seemed, a taste for the theatre; he began by holding horses at the stage door. Very soon he got work in the theatre, became a successful actor, and lived at the hub of the nniverse, meeting everybody, knowing everybody, practising his art on the boards, exercising his wits in the streets, and even getting access to the palace of the queen.

ম, ভাগ্যিস শেক্সপিয়র পুরুষ, তাই তো এই তুমুল জীবন, বিপুল সাফল্য এল তাঁর জীবনে! ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-প্রসূত শেক্সপিয়ার-এর বোনটির কী হাল হল শেষ পর্যন্ত? তার সমস্ত প্রতিভা নিয়ে সে ঘরেই নষ্ট হল, একথা ভেবে নিলে খুব ভুল হবে না।

> She had no chance of learning grammar and logic, let alone of reading Horace and Virgil. She picked up a book now and then, one of her brother's perhaps, and read a few pages. But then her parents came in and told her to mend the stockings or mind the stew and not moon about with books and papers.

ম, শেক্সপিয়ার-এর বোনের গল্পটা এবার অন্যভাবে ভাবছেন ভার্জিনিয়া :

> একদিন জুডিথ তার জামাকাপড়, পয়সাকড়ি একটা পুঁটলিতে বাঁধল। বসন্তের রাত। সে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিল ঘরের জানলা দিয়ে। সেই দড়ি ধরে নেমে এল নীচে। তারপর পালাল—লন্ডনের পথে। তার বয়েস সতেরো। সে খুব ভাল গান করে। পাখির চেয়েও মিষ্টি তার গলা। দাদা শেক্সপিয়ার-এর মতোই ঝলমলে তার বুদ্ধি, তার কথার মধ্যেও ফুটে ওঠে আলো। সেও চায় দাদার মতোই নাটকের দলে যোগ দিতে। সে লন্ডনে পৌঁছেই গেল এক থিয়েটার ম্যানেজারের কাছে—বললে অভিনয় করবে। মেয়েটা থিয়েটারে অভিনয় করবে! তাজ্জব কথা। Men laughed in her face. The manager—a fat, loose-lipped man—guffawed. No woman, he said, could possibly be an actress. নিক গ্রিন নামের অভিনেতা-ম্যানেজার দেখল মেয়েটির কপাল আর চোখ—ঠিক শেক্সপিয়র-এর মতো! বড় করুণা হল গ্রিনের। এবং সেই করুণার দান পেল মেয়েটি—গ্রিন তাকে দিল একটি অবৈধ সন্তান। সেই বছরেই এক শীতের রাতে আত্মহত্যা করল শেক্সপিয়র-এর বোন।

ম, এরপর ভার্জিনিয়া উল্‌ফ লিখেছেন এই অমোঘ লাইন :

> That, more or less, is how the story would run, I think, if a woman in Shakespeare's day had had Shakespeare's genius.

ভার্জিনিয়া সরে যাচ্ছেন আর একটি গল্পে—জেন অস্টেন বা শার্লট ব্রন্টি ইউরোপের যে-প্রান্তে, ঠিক তার অপর প্রান্তে এক যুবকের গল্পে। এই যুবকটি কখনও মুক্ত জীবনযাপন করছে জিপসিদের সঙ্গে। কখনও বা কোনও এক অভিজাত মহিলার সঙ্গে। যাচ্ছে যুদ্ধে। জীবন যা কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছে, সে সব গ্রহণ করছে, কোনও কুণ্ঠা নেই, কোনও বাধা নেই, কোনও সংকোচ বা লজ্জা নেই।

এরপর ভার্জিনিয়া লিখছেন আর একটি মাত্র লাইন :

> জেন অস্টেন বা শার্লট ব্রন্টির মতো 'Had Tolstoy lived in seclusion with a married lady cut off from what is called the world, however edifying the moral lesson, he could scarcely, I thought, have written 'War and Peace'.'

ম, এইবার সেই মূল প্রশ্ন—শেষ পর্যন্ত নিজের ঘর যখন নারী অর্জন করল, তখন কেমন হবে তার সেই ভাবনাভুবন? সে লিখুক, কিংবা ছবি আঁকুক, কিংবা গান করুক, কিংবা শুধুই ভাবুক—সেই ভাবনায় কি সে হয়ে উঠবে তা হলে বিশুদ্ধ নারী? এই বিশুদ্ধ নারী হয়ে-ওঠার মধ্যে কি তা হলে ফুটে উঠবে পুরুষ-বিদ্বেষ? ভার্জিনিয়া লিখছেন, বিশুদ্ধ পুরুষ, বা বিশুদ্ধ নারী বলে তো কিছু হয় না। তাঁর মতে স্বয়ং শেক্সপিয়র-ই তো ছিলেন নারী-পুরুষের সুষম মিশ্রণ :

Shakespeare was androgynous; and so were Keats and Sterne and Cowper and Lamb and Coleridge. Shelley perhaps was sex-less. Milton and Ben Jonson had a dash too much of the male in them. So had Wordsworth and Tolstoy. In our time Proust was wholly androgynous, if not perhaps a little too mnch of a woman.

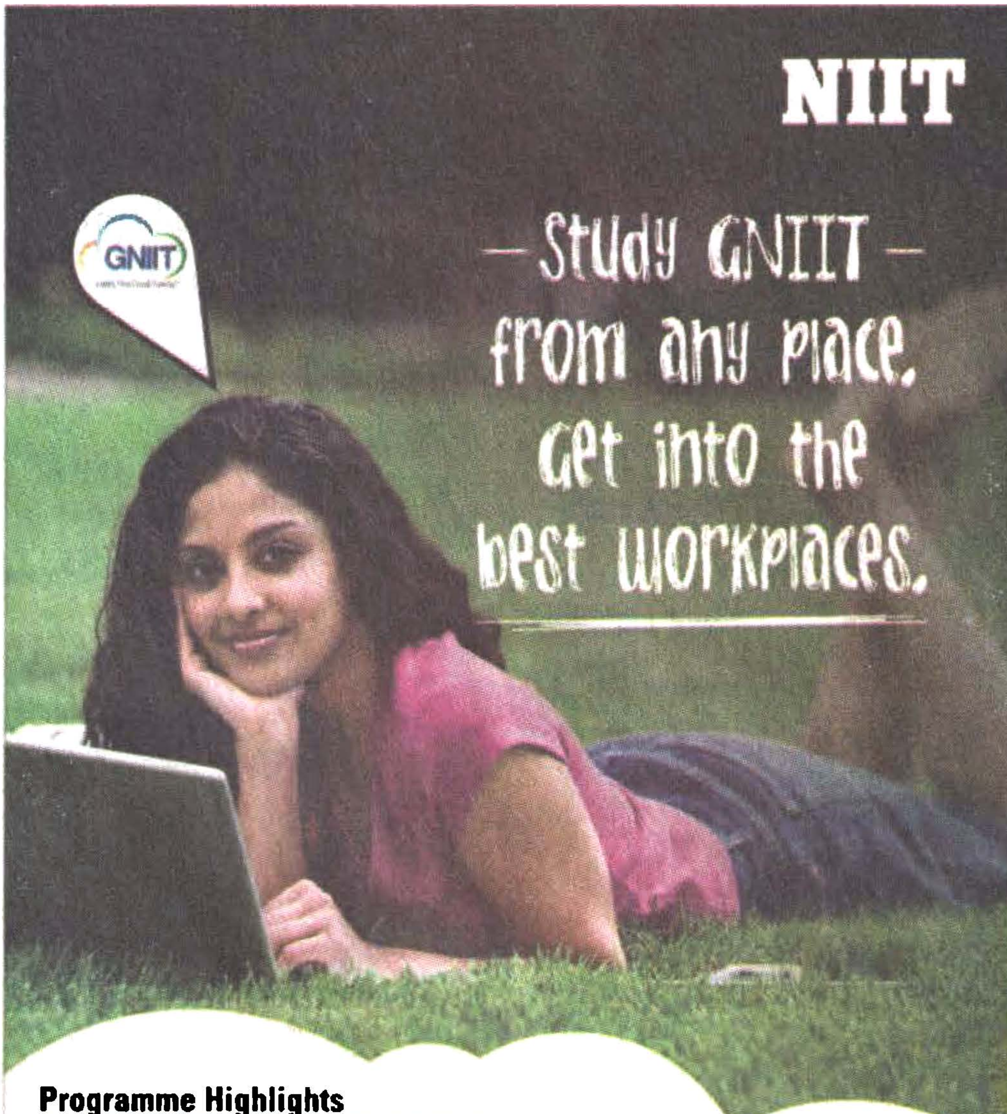
ম, রবীন্দ্রনাথকে তো 'wholly androgynous' ভাবতেই বেশি আরাম পায় আমার মন। তোমার?

তা হলে, এই নতুন নারী, এই স্বাধীন নারী, তার নব-অর্জিত নিজের ঘরে কেমন ভঙ্গিতে বিছিয়ে দেবে তার একা হওয়ার অধিকার, তার একান্ত নিজস্ব ভাবনা? এ-প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছেন ভার্জিনিয়া :

One must be woman-manly or man-womanly. It is fatal to be a man or woman, pure and simple.

ম, তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন—তুমি সেই নতুন মেয়ে যে অর্জন করল, রচনা করল, চিহ্নিত করল এই বিপুল ভুবনে তার নিজস্ব একটি ঘর। তোমার নতুন বাড়ির সেই ঘরে যদি বাড়ি ফিরতাম আমি—তোমার ভাবনাভুবনের ছায়ায় তোমার পায়ে নীরবে আমার মুগ্ধ মগ্ন নতজানু ভালবাসার আঁখিজল রেখে আসতে।

আ রুম অফ ওয়ান'স ওন ● ভার্জিনিয়া উল্‌ফ



Programme Highlights

• One-year paid industry internship • CVs of NIIT Cloud Scholars shared with top I.T. companies • Lateral entry to Semesters 3 & 4 of the B.Sc. (I.T.), B.Sc. (I.T.I.M.) degree awarded by Kuvempu University, Karnataka

NIIT4U

NIIT's Placement Plus: Over 1,12,521 NIITians placed in the last 5 years.

Camac Street Centre Ph: 30580550/544 ; **Kankurgachi Centre** Ph: 30180260/61 **Shyambazar Centre** Ph: 30280346 ; **Gariahat Centre** Ph: 30080004/06 ; **Behala Centre** Ph: 24478746 ; **College Street Centre** Ph: 64551234 ; **Hazra Centre** Ph: 24851770 ; **Garia Centre** Ph: 24306263 ; **Majerhat Centre** Ph: 32421692 ; **Park Circus Centre** Ph: 9836105003 ; **Jadavpur Centre** Ph: 24130194 ; **Nager Bazar Centre** Ph: 65221576 ; **Salt Lake Centre** Ph: 64509596 , **Tollygunge Centre** Ph: 24818390 ; **Vip Centre** Ph: 30576667 ,

Suburban Bengal: Barrackpur Ph 32951653; **Barasat** Ph 25421318; **Shibpur** Ph:26415367; **Madhyamgram** Ph: 25268793; **Uttarpara** Ph: 26642143

নবনীতা দেবসেন

লেখিকার চোখে সম্প্রতি একটা খটোমটো অপারেশন হয়েছে। তাই নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর গোমড়াথেরিয়াম হওয়া তো দূরস্থান, একদম সুকুমার রায়-এর স্টাইলে ও সরসতায় তিনি লিখে ফেললেন চকমকি-র মতো আলোভর্তি একটা ছড়া!



চক্ষুদান

একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামত
কাটাছেঁড়া ভাঙাচোরা চটপট মেরামত
ভেবে ভেবে জল হল শরীরের রক্ত
পরিজন কেঁদে কন এ তো বড় শক্ত!
কাঁটাছেঁড়া টুকটাক কতশত যন্ত্র
ভেঙেচুরে দেবে জুড়ে তারও জানে মন্ত্র
জিভ কাটে, গলা কাটে, পকেটেতে হস্ত
মগজ কলিজা কাটে, কাটে তো সমস্ত
এইবারে বলি তাই মণি চাই আস্ত
ওরে ভোলা খুঁজে দেখ ভালো মণি পাস্ তো।
উৎসাহে কী না হয়, কী না হয় চেষ্টায়?
কার মণি কার চোখে জুড়ে দিলো শেষটায়!

২২.১০.১১

nabaneetadevsen@gmail.com



প্রস্তুতকারকের
তরফ থেকে
আমার এই
ছোট্ট জগত...
যেখানে যত্নের
আরেক নামই
হল সফ্‌স্কিন
প্রাণ এলো ত্বকে –
সফ্‌স্কিনের ছোঁয়ায়।
নিম তুলসীর সুরক্ষা
তো রয়েছেই,
এবার অ্যালোভেরার
ময়শ্চারাইজিং গুণে
আমার ত্বক উজ্জ্বল-উচ্ছল।
সবই পেলাম –
সবসময়ের জন্যে, দিনে-রাতে।
ঘরে কিংবা বাইরে।
Sofskin
সফ্‌স্কিন
হালকা আয়ুর্বেদিক ক্রীম
₹২০/-
সঙ্গে থাকে, ভালো রাখে
Thoughtshop CPL '11

পবিত্র সরকার

স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার

আজ সুকুমার রায়ের জন্মদিন। তাঁকে বাচ্চাদের লেখক বললে সবটা বলা হয় না। আবার শুধুই বড়দের বলে দেগে দিলে, অতিশয়োক্তি ঘটে। তাঁকে নিয়ে পাঠকে-পাঠকে ছাড়াছাড়ি না-হয়ে বরং কাড়াকাড়ি হোক।



১. বার বার কেন?

সুকুমার রায়কে নিয়ে সব কথা কি এখনও বলা হয়ে যায়নি? আর কী বলা বাকি আছে? শতবর্ষ গেল, ১৯১২-তে এসে যাচ্ছে তাঁর জন্মের একশো পঁচিশ বছর, তাই কি তাঁকে নিয়ে আবার একটা ধুমধাড়াক্কা শুরু করব আমরা, না কি এই প্রতিভার রচনার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা এই সব উপলক্ষমাত্রে ফুরিয়ে যায় না, উপলক্ষকে পার হয়ে তাতে এমন কিছু থেকে যায়, যা আমাদের প্রতিদিন আস্বাদনের বস্তু, প্রতিদিনকার মনোযোগ ও ভাবনার বস্তু!

এটা তো ঠিক যে, একশো হোক, একশো পঁচিশ হোক, সুকুমার রায়কে নিয়ে কথা বলতে হলে দুর্লভ পুরনো লাইব্রেরির ধুলো-পড়া আলমারির এলোমেলো দুষ্প্রাপ্য বইয়ের মধ্য থেকে তাঁর বই খুঁজে বার করতে হয় না। তিনি লেখাপড়া-জানা-বাঙালির প্রায় প্রতি ঘরে আছেন, স্কুলে তাঁর কবিতা আবশ্যিক শিক্ষাপাঠ। এমনকী লেখাপড়া শুরু করার আগেই বাঙালি শিশু মৌখিক আবৃত্তির মধ্য দিয়ে, ছন্দের দোলা ও খেলার মধ্যে, তাঁর 'বাবুরাম সাপুড়ে', 'সৎ পাত্র', 'ভয় পেয়ো না' ইত্যাদি বহুবিধ কবিতার সঙ্গে আনন্দময় সখ্য লাভ করে। সে বিচার করে না, তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে উপভোগ করে। স্কুলে আর একটু বড় হলে সে পড়তে পারে সুকুমারের কবিতা ও গল্প, কিংবা নাটক ও অন্যান্য রচনা, তাও নিশ্চয় সে বেশ কিছুটা উপভোগ করে, যতক্ষণ না তাকে পাঠ নিয়ে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হয়। পরীক্ষাও অবশ্য সুকুমার পড়ার মজা নষ্ট করতে পারে না, তার কারণ, সুকুমারের মতো মজাদার লেখক সারা পৃথিবীর সাহিত্যেই কম আছেন। অবশ্যই সুকুমারের বেশ কিছু লেখা আছে, যেগুলি তিনি মজা তৈরি করার জন্য লেখেননি। যেমন তাঁর গদ্যরচনার মধ্যে জীবনী, জীবজগৎ, বিবিধ এবং বড়দের জন্য লেখা নানা প্রবন্ধ, যার মধ্যে 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রবন্ধ'-র নাম উল্লেখ করা যায়। শেষ গুচ্ছটি বাদ দিলে তাঁর ছোটদের জন্য যেসব গদ্যরচনা, জীবনী, জীবজগৎ, বিবিধ ইত্যাদি—সেগুলিতে যে একেবারেই মজা নেই তা মোটেই নয়; কিন্তু সে-মজার ধরনটা অন্যরকম। তাতে মজাদার গল্প থাকে, যেমন বিবিধ-র 'সূক্ষ্ম বিচার'-এ "একজন লোককে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে তৎক্ষণাৎ কাগজ পেন্সিল লইয়া হিসাব করিয়া বলিল, 'আঠার বৎসর তিন মাস ষোল দিন চার ঘণ্টা—কত মিনিট ঠিক বলতে পারলাম না'।" কিংবা থাকে মজাদার পর্যবেক্ষণ, যেমন জীবজগৎ-র 'জানোয়ারের ঘুম' লেখাটির আরম্ভে—'এক একজন মানুষের ঘুমাইবার ধরন দেখি এক একরকম। কেউ চুপচাপ নিরীহভাবে আড়কোসড়ো হইয়া ঘুমায়, কেউ ঘুমের মধ্যে হাত-পা ছুড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিয়া অস্থির হয়, কেউ বা তুমুল নাসিকাগর্জনে রীতিমত যুদ্ধের কোলাহল সৃষ্টি করিয়া তোলে।'

এসব থেকে বোঝা যায়, সুকুমার যখন তথাকথিত 'জ্ঞান দেওয়ার' জন্য লেখেন, তখনও কাদের জন্য লিখছেন, তা তাঁকে সবসময় খেয়াল রাখতে হয়। লিখছেন 'সন্দেশ' পত্রিকায়, তা ছোটদের কাগজ। তার পাঠকেরা সম্ভবত স্কুলের মাঝারি ক্লাসের ছাত্র (তখন ছাত্রীও কিছু নিশ্চয় ছিল), তারা প্রবন্ধগুলো পড়বে। প্রবন্ধ ছোটদের অভ্যস্ত এবং প্রিয় পাঠ নয়। ফলে এসব প্রবন্ধের মধ্যেও গল্পের মজা আনতে হবে। যদি মাস্টারি করতেই হয়, তবে এ মাস্টারজির চোখ গরম, মুখ গম্ভীর, গলায় গর্জন, হাতে বেত থাকবে না; এ মাস্টারটি হবেন আড্ডাবাজ বড়দা বা সেজোমামার মতো। সুকুমার সেইভাবেই এই 'জ্ঞানের' লেখাগুলো লিখেছেন। জ্ঞান আছে, কিন্তু হালকা মজাদার কথার মোড়কে তাকে পরিবেশন করা হয়েছে।

২. কবিতার মজা অন্যরকম

কিন্তু তাঁর কবিতার যে দারুণ মজা, যে মুচকি, হোহো, হাহা, হিহি থেকে অট্ট ও উদ্দাম নানারকম হাসির ব্যবস্থাপনা, সে-মজার উৎসটাই আলাদা, যেমন আলাদা তার লক্ষ্য। গল্পেও তাই। নাটকেও কিছুটা তাই, কিন্তু তাঁর সব নাটক একরকম নয়, তাই তার কথা একটু আলাদাভাবে বলতে হবে।

কবিতায় অধিকাংশ মজার সূত্র হচ্ছে 'আবোল তাবোল' বকুনি। 'আবোল তাবোল' কথাটা

ইংরেজি 'ননসেন্স' কথাটার সার্থক বাংলা বলে আমি মনে করি। তবে একটা সংশোধন-সহ। এ নয় পাগলের যা-খুশি-তাই বকুনি, কিংবা নেশাগ্রস্তের প্রলাপ। তাতে কদাচিৎ এমন মজা থাকে। সুকুমারের কবিতার 'আবোল তাবোল' (শুধু ওই নামের বইটার কবিতা নয়) তৈরি হয়েছে গভীর সচেতন ভাবনাচিন্তা থেকে। অন্যদের ক্ষেত্রে এরকম কাজে কিছুটা কোস্তাকুস্তির ঘামজল বেরিয়ে পড়ে, সুকুমারের ক্ষেত্রে তা যে হয় না, তার কারণ তাঁর প্রতিভার চরিত্রই আলাদা। এই 'আবোল তাবোল'-এর 'ব্যাকরণ' তাঁর মাথার মধ্যে এমনভাবে এক জটিল কারখানার মতো চালু আছে যে, তা থেকে অনর্গল উৎপাদন চলে। ছন্দের নানা চমকপ্রদ সম্ভাবনা, অবিশ্বাস্য সব মিল, শব্দের ধ্বনিশরীরে অচেনা শব্দের মধ্যে দূরবর্তী আত্মীয়তা, যা আমাদের খেয়ালই থাকে না—অথচ কেউ দেখিয়ে দিলে চমকে উঠি, তার ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে ভাব ও ঝগড়ার সম্পর্ক, একই শব্দের নানা হাজারো অর্থের ওপর সম্পূর্ণ দখল, তাঁর মস্তিষ্কে যেন কম্পিউটারের মতো সাজানো ছিল।

আর ছিল এক উদ্দাম কল্পনা। পৃথিবীতে কী হতে পারে আর কী হতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ধারণা খুব ছোট বাক্সের মধ্যে এঁটে যাবে। কিন্তু সুকুমার আর একটা . আস্ত বিকল্প অসম্ভবের পৃথিবীকেই যেন তাঁর মস্তিষ্কে বহন করছেন, বোতাম টিপতেই সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে সব জীবজন্তু, যারা যতটা মারাত্মক তার চেয়ে অনেক বেশি মজার। আসছে অদ্ভুত মানুষের দল, যাদের কথাবার্তা আচার আচরণ ভাবনা পরিবেশ সবই বীভৎস রকমের মজাদার। অর্থাৎ 'ভাষা' আর 'কল্পনা'—এই দু'দিক দিয়ে, এবং প্রায়ই দু'টোকে একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে, সুকুমার তাঁর কবিতায় এবং অন্যত্রও, একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন। ভাষার ব্যাকরণ আর কল্পনার ব্যাকরণ, দু'য়েরই সব গলিঘুঁজি তাঁর ছিল পরিষ্কার জানা। ভাষায় কত দূর কী হতে পারে, কোন নিয়ম কতটা লঙ্ঘন করলে ভিন্ন ধরনের মজা হয়, আবার কতটা পেরিয়ে গেলে মজা নষ্ট হয়, এর সমস্ত বিষয় ছিল তাঁর নখদর্পণে। কল্পনার ব্যাকরণের বেলাতেও তাই। আমরা বোঝার সুবিধের জন্য দু'টোকে আলাদা করছি বটে, কিন্তু আসলে দু'টো আলাদা নয়। কল্পনা যেমন ভাষার ওপর নির্ভরশীল (আমরা যা কল্পনা করি তা ভাষার সাহায্যেই করি), তেমনই কল্পনার জৌলুস না-থাকলে ভাষাও খোলভাই চেহারা নিয়ে সাহিত্যের মঞ্চে উঠে বসতে পারে না।

ভাষা নিয়ে সুকুমারের বিচিত্র প্রযুক্তিকৌশলের কথাটা আগে বলি। যেমন তাঁর ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতি ঝোঁক দেখি অনেক জায়গায়। 'খাই খাই' বইতে বেশি করে আছে তাঁর ভাষা নিয়ে খেলার কবিতা। 'চলে হনহন ছোটে পনপন, ঘোরে বনবন, বাজে ঠনঠন' যেমন আছে, তেমনই আছে এক মহাবাবুর কথা, যে 'চলে খচখচ রাগে গজগজ, জুতো মচমচ



হানে/ছুরে কটমট, ছড়ি খটখট লাথি চটপট হানে।' শব্দ আর অর্থের খেলার শুরুতেই তিনি বলে দেন, 'এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা'। প্রথমেই 'দাঁড়ি' কথাটা নিয়ে খেলা, তার সঙ্গে 'দাড়ি' জুড়ে এক তুমুল হট্টগোল। কিন্তু পরের দু'টো কবিতায় ('পাকাপাকি' আর 'খাই খাই') 'পাকা' আর খাওয়া নিয়ে কত কাণ্ড। আম পাকে, আবার কাঁচা ইঁট পাকে আগুনে পোড়ালে। পাকা রং, পাকা ফলার, পাকা ছেলে, পাকা বুদ্ধি, পাকা কথা—কত রকমের 'পাকা' আছে, আছে হাত পাকানো, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো। 'খাই খাই'-এ খাওয়া নিয়ে এক মহাভারত : দুধ খাওয়ার সঙ্গে বিড়ি খাওয়া, বাপ খাওয়া, খাবি খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া থেকে কচুপোড়া খাওয়ার ঘণ্টা খাওয়াতে নিয়ে শেষ করেছেন সুকুমার, এতে আমাদের হিমসিম খাওয়ার জোগাড়। কত খাওয়া আর তার কতরকমের অর্থ আছে ভাষায়, একটা কথার বদলে আর একটা কথা বসালেই কেমন তার অর্থ বদলে যাচ্ছে, সে এক নাগরদোলার খেলা। 'পড়ার বিপদ' কবিতায় ছুটিতে গদাই কতটা পড়াশোনা করেছে, তার উত্তরে গদাই খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলে :

মাথার মাড়ি বেজি যাওয়া অস্থি গায়ে চড়া,
একেবারে অস্থি ক্লাস পড়ার মত পড়া।

সুকুমার জানেন শিশুরা ভাষা শেখার সময় শব্দ নিয়ে নানারকম খেলা করে, তাই তাদের ভাষার এই খেলার জায়গাটার বিশাল ময়দানের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়েছেন। খেলুক তারা যত পারে। এইভাবে একটা বিদঘুটে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন আর এক কবিতায়, "মাথায় যাদের গোল বেধেছে তাদের কেন 'পাগোল' কয়?" 'আবোল তাবোল'-এর 'শব্দকল্পদ্রুম' কবিতায় তো নামেই আছে ধ্বনি আর অর্থ নিয়ে খেলা। রাধাকান্ত দেব-এর সংস্কৃত অভিধানের নাম 'শব্দকল্পদ্রুম'। সেখানে 'দ্রুম' শব্দের অর্থ হল গাছ। কিন্তু সুকুমার বোঝাতে চেয়েছেন 'দ্রুম' অর্থাৎ 'দুড়ুম্' গোছের আওয়াজটার কথা। ওই কবিতায় যেসব শব্দের দু'টো করে অর্থ তিনি ব্যবহার করেছেন, তার একটার আছে ধ্বনি বা আওয়াজের অনুষঙ্গ, আর একটার আছে সাধারণ একটা কাজের অর্থ। 'ফোটা' কাজটা ফুলের বেলায় একরকম, আর পটকার বেলায় আর একরকম ('ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্)'। পড়ছে হিম, কিন্তু পাহাড়ের ধসে পাথর পড়ার মতো তার শব্দ হচ্ছে 'হুড়মুড় ধুপ্ ধাপ্'। রাত 'কাটছে' 'খ্যাচ্ খ্যাচ্ ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্' শব্দে, ব্যথা বাজছে 'ঠ্যাঠ্যাং ঢ্যাঁঢ্যাঁ', আর বুক ফাটছে 'ফট্ ফট্'। এমনই সব ধ্বনি আর অর্থের ঝগড়া বাঁধিয়ে সুকুমার কত মজা তৈরি করছেন।

অন্য আর একরকম মজা 'খিচুড়ি' কবিতায়। এখানে শব্দের শরীরে অস্ত্রোপচার করে, কখনও আগের শব্দটার ল্যাজ কেটে, পরের শব্দটার মুড়ু কেটে, ইংরেজিতে 'পোর্টম্যান্টো' করে, দু'টোকে জুড়ে নতুন শব্দ বানাচ্ছেন তিনি, তাতে কল্পনাও কেমন ধুন্ধুমার বেঁধে যাচ্ছে, অদ্ভুত কিম্ভূত সব জানোয়ার তৈরি হচ্ছে। হাঁস-সজারু হয়ে গেল 'হাঁসজারু'। এইভাবে 'বকচ্ছপ' (বক+কচ্ছপ), 'বিছাগল' (বিছে+ছাগল), 'গিরগিটিয়া' (গিরগিটি+টিয়া), 'মোরগরু' (মোরগ+গরু), 'সিংহরিণ' (সিংহ+হরিণ), 'হাতিমি' (হাতি+তিমি) ইত্যাদি।

তাঁর অসাধারণ শব্দকল্পনার একটি দুর্ধর্ষ উদাহরণ—পাগলা ভোলার জগাই মদনাকে ভূত-মায়ের বিচিত্র আদরের ভাষা :

আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে,
দেখ্ না ফিরে, প্যাখ্না ধরে হুতোম হাসি মুখ ক'রে।
ওরে আমার বাঁদর নাচন আদর গেলা কোঁৎকা রে!
অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁৎকা রে!
ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্টি মাসের বিষ্টি রে।
ওরে আমার হামান ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টি রে।
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোছনা হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোবরাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুসরে,
ছিঁচকাঁদুনে ফোক্‌লা মানিক...

কী অনর্গল আর স্বতঃস্ফূর্ত, আর কী উদ্দাম তাঁর এই শব্দকল্পনা! এখানে 'শব্দ' আর 'কল্পনা' এ-কথা দু'টোকে আর আলাদা রাখার উপায় নেই বলে একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে হল।

৩. কল্পনার দুই পৃথিবী : পাগলা গারদ ও চিড়িয়াখানা

তবু নিছক ভাষানির্ভর মজা থেকে কল্পনানির্ভর মজাকে আলাদা করা সম্ভব। এর দু'টি প্রধান শাখা আছে : একটি হল, মানুষের জগতের নানা চরিত্র, প্রাণী ইত্যাদির অতিরঞ্জিত, অভাবিত বা উদ্ভট কথাবার্তা ও আচরণ, চেনা পৃথিবীর মধ্যে অচেনা কাণ্ডকারখানা। এখানে সম্ভবকে অসম্ভবের অতিরঞ্জিত করেন সুকুমার, খুব কম ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্যকে প্রশ্রয় দেন। একটি ইংরেজি কথা ব্যবহার করে বলি, পাগলা গারদের চরিত্রগুলো মূলত তাঁর 'ডিসকভারি'। আর একটি হল, অসম্ভব সব প্রাণীর পৃথিবী, সুকুমারের সৃষ্ট এক নতুন চিড়িয়াখানা। এগুলো মূলত তাঁর 'ইনভেনশন'। একটা 'আবিষ্কার', আর একটা 'উদ্ভাবন'। মূলত, সবটা নয়।

প্রথমে পাগলা গারদে ঢুকে পড়া যাক। এ পাগলরা মোটেই ভয়ংকর নয়; বেশ মনোহর, মজাদার সব পাগল। পাগল না-বলে বাতিকগ্রস্তও বলা যায়। একজন 'আবোল তাবোল'-এর কাঠবুড়ো। সে-বুড়ো আমাদের খুব অচেনা নয়, এরকম খ্যাপাটে বুড়ো আগে প্রায়ই দেখা যেত। কিন্তু তার কাঠ সেদ্ধ করার ব্যাপারটাই সুকুমারের নতুন কল্পনা, আর সেটাই, বুড়োর কাঠ-সংক্রান্ত নানা বক্তব্য ও আচরণ নিয়ে, এই কবিতার মজার ভিত্তি। হেড আপিসের বড়বাবু তো কতই ছিল বা আছে, কিন্তু তাদেরই একজন যে তার গোঁফ চুরি গিয়েছে বলে খেপে যাবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল? আসলে প্রচুর খ্যাপাটে লোক জোগাড় করেন সুকুমার, সকলেরই কোনও-না-কোনও বিষয়ে কম-বেশি পাগলামি আছে। কারও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে মনে হয় পাউরুটি আর ঝোলাগুড়-কে, কেউ গানের গুঁতোতে সবাইকে পাগল করে দেয়, কোনও বুড়ো দেখা হলেই কাতুকুতু দেয়, এক অদ্ভুত বুড়ো দৌড়ে জেতার অভিনব এক কল আবিষ্কার করে, (আরও উদ্ভট আবিষ্কার আছে সুকুমারে, যেমন 'গন্ধবিচার'), কেউ বা লড়াই খ্যাপা, কেউ ছায়া ধরার ব্যবসা করে, কেউ গল্প বলার সময় প্রতি কথায় বাগড়া দেয়, কোনও রাজা নতুন একটা গন্ধ পেয়ে অজানা ভয়ে অস্থির হয়, আবার বোম্বাগড়ের রাজা আর রাজপরিবারের কাণ্ডকারখানা তো অকথ্য নয়। কেউ বইয়ের পাতায় 'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়?' প্রশ্নের উত্তর খোঁজে, কেউ বাবুরাম সাপুড়ের কাছে আভিপ্রায় হয় ও দুধভাত খাওয়ানো দু'টি সাপ চায় মহানন্দে পিটিয়ে মারার জন্য, তিন আহ্লাদী অকারণে হেসে চলে, কোনও কাঁদুনে ('বুড়ো সাহেবের বাচ্চা') কেঁদে সবাইকে তুমুল নাজেহাল করে, একদল ডানপিটে ছেলের কথা পাই যারা 'পিলেপোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে', একজন 'নোটবই'-এর মাহাত্ম্য নিয়ে মত্ত অফসল, কেউ আধিপত্যের স্পর্ধা নিয়ে অকারণ ঝগড়া বাধাতে গিয়ে পিছিয়ে এসে 'জেরি তেরি অড়! মস্তকা খাবি', বলে শান্তিস্থাপন করে। ষষ্ঠীচরণ বলে একজন খেলার ছলে 'হাতি লোফেন যখন তখন'। 'খাই খাই'-এও আছে আশিআশি বছরের দুর্দম নাচিয়ে-বুড়ো, আর একজন 'দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর, শ্মশানঘাটে শস্যানি খায় দশবাহু দশধর' কথাটার মানে সবাইকে জিজ্ঞেস করে উত্তাল করে দেয়। এ বইয়ে আছে অকারণ বিস্ফুটিয়া, আছে খুবই স্নেহপ্রবণ একটি গাধা—সে আর খাঁটি খাঁটি চিড়িয়াখানার জীব হয়েও কিছুটা পাগলা গারদেই ঢুকে পড়ে।

এই পাগলা গারদে সবটাই সেই সব চরিত্রের নিজস্ব কৃতিত্বের বিবরণ নয়। সুকুমার নিজেও তাঁর বর্ণনার মধ্যে তৈরি করেন মজার অসংগতি, যার ফলে 'সৎ পাত্র'-কে আমাদের ততটা সৎ পাত্র বলে মনে হয় না। তার সম্বন্ধে ইতিবাচক খবরগুলোকে এমনভাবে সাজান তিনি, যাতে সেগুলো প্রতি মুহূর্তে 'সৎ' কথাটিকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। কোথাও আবার যা স্বাভাবিক,

তাকেই অত্যাশ্চর্য অস্বাভাবিক করে দেখান কারও বয়ানে—'বদ্যিবুড়ো থাকে, সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে।'

'খাই খাই'-এ শব্দের খেলার বাইরে যা আছে, তার বেশির ভাগই অঘটনের গল্প। এর সঙ্গে পাগলা দাশু-র গল্পগুলোর কিছুটা মিল আছে। এরকম অঘটনের খবর পাই 'আবোল তাবোল'-এ হুলোর অত্যন্ত করুণ গানে, কিংবা 'ফসকে গেল' কবিতায়।

এবার তাঁর আজব চিড়িয়াখানায় একটু ঘুরে আসি। এ ধরনের কল্পনা পৃথিবীর সাহিত্যে নতুন নয়, গালিভার-এর বৃত্তান্ত থেকে বহু বহু রূপকথাতে এ ধরনের বিচিত্র জীবজন্তুর দেখা মেলে। 'আবোল তাবোল'-এ 'খিচুড়ি' জাতীয় প্রাণীদের দিয়ে তা শুরু হয়, তারপরে আমরা একে-একে পাই কুমড়োপটাশ, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, পান্তভূত আর তার ছানা, রামগরুড়ের ছানা, ট্যাঁশ গরু, 'ভয় পেয়ো না'-র সেই মিষ্টি-কথা দৈত্যটিকে। এই চিড়িয়াখানার সদস্য হবে 'হযবরল'-র কাকেশ্বর কুচকুচে, হিজিবিজ্‌বিজ্, ব্যাকরণ সিং, বিচারক প্যাঁচা, সাক্ষী জোগাড় করা কুমির আর আসামী সজারু, যদিও হিজিবিজ্‌বিজ্ ছাড়া অন্যরা কেউ পুরো অসম্ভবের দেশ থেকে আসেনি। কিন্তু 'হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'-র 'হ্যাংলাথেরিয়াম', 'ল্যাগব্যাগর্নিস', 'গোমড়াথেরিয়াম', 'বেচারাথেরিয়াম' আর 'চিল্লানোসোরাস' এই কিম্ভূতরা চিড়িয়াখানার আর একটি এলাকা দখল করে নিশ্চয় থাকবে। দু'ক্ষেত্রেই মানুষের নানা চরিত্রের প্রতিফলন আছে এই আজব জানোয়ারগুলোতে, কখনও-কখনও তারা রূপকের কাছ ঘেঁষে চলে গিয়েছে। শুধু আশপাশের মানুষের আচরণে নয়, প্রকৃতির মধ্যেও কখনও-কখনও এসব নিয়মকানুন উলটে দেওয়া কিম্ভূত ঘটনা ঘটে। আকাশের গায়ে টকটক গন্ধ পাওয়া যায়, আবার শিম গাছে শিম হয়, হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা এবং কাকের বাসায় বকের ডিম দেখা যায়। বিদেশের 'মাদার গুজ'-এর ছড়ায় এরকম প্রচুর অসংগত ঘটনার বিবরণ পাই আমরা।

৪. গল্প ও নাটক

'হযবরল' তো 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' ধরনের ফ্যান্টাসি, তার হিসেব আলাদা। সেখানে নানা অসম্ভব কাণ্ডকারখানা ঘটতেই পারে, অসম্ভব জীবজন্তু, এমনকী উধো-বুধোর মতো মানুষও থাকতে পারে। আর তা ছাড়া সেটা স্বপ্নের গল্প, লিউইস ক্যারল-এর গল্পের মতোই, কাজেই স্বপ্নে অসম্ভবকে অনায়াসেই আমন্ত্রণ জানানো যায়।

কিন্তু পাগলা দাশু স্বপ্নের গল্প নয়, অন্য কোনওরকমের ফ্যান্টাসিও নয়। তার গল্পগুলো মূলত বিদেশি 'স্কুল স্টোরিজ'-এর শ্রেণিতে পড়ে। আগেই বলেছি, এগুলো মূলত অঘটন-নির্ভর আখ্যান। যারাই একটু বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে, বাহাদুরি করার জন্য, অন্যদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু করতে গিয়েছে, তাদেরই নানা ফ্যাসাদের মধ্যে পড়তে হয়েছে। কখনও সেই ফ্যাসাদ এসেছে দাশু-র তথাকথিত 'পাগলামি' 'খ্যাপামি' 'শয়তানি' থেকে, কখনও তা এসেছে নিছক ঘটনাক্রমে। প্রবল আত্মবিশ্বাসী চরিত্রগুলো কেউ 'সবজান্তা', কেউ 'চালিয়াত' কেউ 'সর্দার' (ভোলানাথ যেমন), কেউ পেটুক, কেউ নিজেদের অতিবুদ্ধির শিকার।

নাটকগুলোতে কোনওটায় আছে কথা নিয়ে খেলা, আর তার ভিত্তিতেই নানা অভাবিত কাণ্ড ('অবাক জলপান'), কোথাও রামায়ণের ঘটনার ভক্তিহীন সম্ভ্রমহীন প্যারডি ('লক্ষ্মণের শক্তিশেল'), কোনওটায় পাগলা গায়কের নতুন আখ্যান ('ঝালাপালা')। সব নাটকেই ঘটনা ও সংলাপের এমন অভূতপূর্ব চাতুর্য আছে যে, তা দেখাতে হলে পুরো নাটকই তুলে দেখাতে হয়। লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে ধরাশায়ী করে রাবণ তার পকেট কাটে, হনুমান দূর থেকে দেখে বলে, 'অ্যাঁ, কী হচ্ছে, দেখে ফেলেছি!' ইংরেজি-হিন্দি নানা ভাষার প্রয়োগ ('ঝালাপালা'-তে পুলিশের সঙ্গে কথায়-কথায় ভুল সংস্কৃত বলা পণ্ডিতের সংলাপ মনে করে দেখুন, 'দেখো, হামরা পান্ধের বাড়িতে দিন রাত তক্ এইসা কাঁচকাঁচ করতা, নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হোতা হ্যায়—ইসকা কুছ প্রতিকার হয় না রে ব্যাটা?' বা 'ওয়ান্স আই মেট এ লেম ম্যান ইন এ লেন'-এর বিচিত্র অনুবাদ 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল)—মণিমুক্তোর শেষ নেই। এ সম্বন্ধে আমরা আগে লিখেছি। ভাষার মজা কতরকমের হতে পারে, সব ছিল এই মানুষটির হাতের তালুতে বন্দি। দু-একটা নমুনা দেওয়ার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। তাতে আছে অসম্ভব মজার সব গান : 'যে দেশের শ্রেষ্ঠতার এত ভুরি ভুরি প্রমাণ বর্তমান, আজকাল সবাই কিনা তাকে অবজ্ঞা করিতেছে আর সবাই দেখাতেছে মর্তমান!' আছে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জবরদস্ত সব প্যারডি :

একদা সকালে আমি খাইতেছিলাম ভাত
হেন কালে ধেয়ে আসে প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র
ভয় পেয়ে সকলে ও থরহরি কম্পমান
চিৎকারিল কেহ সুকরুণ আর্তরবে...

না, আর নয়। সুকুমার রায়ের বিষয়ে প্রবন্ধ পড়ার চেয়ে অনেক, অনেক মহৎ কাজ সুকুমার রায় পড়া। পরকাল আছে বলে জানি না, কিন্তু ইহকালে অনেক কাজ দেবে।

৫. কাদের লেখক সুকুমার?

তাঁর শতবর্ষের সময়ে এমন কিছু লেখা বেরিয়েছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, সুকুমার রায় শুধু বাচ্চাদের লেখক নন, তাঁর বাচ্চাদের কবিতাগুলোতেও বড়দের ভাবনাচিন্তার অনেক-অনেক মালমশলা পাওয়া যাবে। এ কথাটা এক হিসেবে ভুল নয়। মর্মান্তিক দুঃখের ইঙ্গিত আছে 'আবোল তাবোল'-এর 'ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর/গানের পালা সাঙ্গ মোর' ছত্র দু'টিতে। বাংলার তখনকার সমাজ নিয়ে ব্যঙ্গ তো 'সৎ পাত্র'-তেই আছে, আছে কোথাও-কোথাও রূপকের আড়ালে কিছু খোঁচা, যেমন 'একুশে আইন', 'ট্যাঁশ গরু'। নিশ্চয় আছে। সেগুলো বড়দের জন্য হয়তো কাজও। কিন্তু তা বলে এ-কথা বলা চলবে না যে, বড় পাঠকদেরও কেউ যদি ওই অর্থগুলো বাদ দিয়ে পড়ে, তা হলে তার উপভোগ কম হবে, বা কারও তার আনন্দকে বা সাহিত্যবোধকে অনুকম্পা করার অধিকার জন্মাবে। আর আনন্দ, যেমনই হোক, সাহিত্যবোধের চেয়ে কম দামি কিছু নয়। নাটকগুলোতে তৎকালীন ব্রাহ্মধর্মের গোষ্ঠীবিরোধের ছায়া পড়েছে, তাও মিথ্যা নয়। কিছু নাটক ('চলচিত্ত-চঞ্চরি', 'শব্দকল্পদ্রুম' ইত্যাদি) অবশ্য মূলত বড়দের জন্যই লেখা, সেগুলো নিয়ে পাঠক-সংঘাতের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু সুকুমারের ছোটদের জন্য লেখাগুলোকেও যদি বড়রা তাঁদের নিজেদের জন্য ছিনিয়ে নিতে চান, তা হলে তো একটু মুশকিল হয়।

হ্যাঁ, রলাঁ বার্থ বলে একজন ডাকসাইটে পণ্ডিত 'লেখকের মৃত্যু' ঘোষণা করে দিয়েছেন বটে, বলেছেন, লেখা পড়তে-পড়তে পাঠকরাই লেখক হয়ে যান, লেখক তাঁর লেখা থেকে নির্বাসিতই হন একরকম। কিন্তু শিশুদের জন্য সুকুমার রায়ের লেখা শিশুদের জন্য নয়, এ দাবিটা একটু চরম দাবি। ঠিক আছে, বড়রা তাঁদের মতো করে পড়ুন সুকুমারকে, কিন্তু অন্যদেরও তাদের মতো করে পড়তে দিন। সুকুমারের লেখা নিয়ে, পাঠকে-পাঠকে ছাড়াছাড়ি না হয়ে কাড়াকাড়ি হোক।

মনে রাখতে হবে যে, সুকুমার লেখাগুলো লিখেছিলেন অল্পবয়সি পাঠকদেরই জন্য, ছোটদের কাগজ 'সন্দেশ'-এ। অসাধারণ সব ছবি তিনি এঁকেছেন ছোটদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে, যে ছবির তুলনায় তাঁর বিপুল গুণবান পুত্রের ছবিও একটু সাধারণ মনে হয়। তিনি নিশ্চয় এই আশা নিয়ে বসে থাকেননি, সেই বড়রা বা ছোটরা সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বুঝে পড়বে।

কিন্তু সেসব বুঝে পড়তে গিয়ে জ্ঞানী বড়রা যদি সুকুমারের অভাবিত ও মারাত্মক 'মজা'-টাকে উপেক্ষা করেন, তা হলে তাঁরাই ঠকবেন, এটাই আমাদের বিনীত বিশ্বাস। এরকম মজার লেখক পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।

শান্তনু চক্রবর্তী

'তালব্য শ'-র সন্ধানে

এর ধড়, তার মুড়ো ইত্যাদি 'আবোল তাবোল' জুড়ে দেওয়ার পাশাপাশি সুকুমার ননসেন্সের সঙ্গে গহন কবিতাকেও গোপনে বুনে দিয়েছেন। নকআউটের পরেও, প্রতিপক্ষ তাই বুঝতে পারে না, খেল-খতম অনেকক্ষণ!



প্রোফেসর হিজিবিজবিজ-কে মনে আছে? সত্যজিতের গল্পের সেই যে সর্বকর্মা মহা-বৈজ্ঞানিক, যিনি ছোটবেলা থেকে স্রেফ দু'টো মাত্র বই পড়েছেন, 'আবোল তাবোল' আর 'হযবরল'? এই হিজিবিজবিজ বাবুর ল্যাবরেটরিতে সেই কবে থেকেই ল্যাজা-মুড়ো জোড়া লাগিয়ে, 'খিচুড়ি'-র গিরগিটিয়া, হাঁসজারু, বকচ্ছপ-রা দিব্যি পয়দা হচ্ছিল! কিন্তু মুড়ো-ধড়ে খাপ খেলেও মনের ঝিলমিল হচ্ছিল না বলে, পুরনো প্রোজেক্ট বাতিল করে এইচবিবি মশাই নতুন 'অপারেশন ভয় পেয়ো না' নিয়ে গবেষণায় মেতেছিলেন। শুধু মাতেননি-ই নি, তাঁর ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-চাকর-কাম-রাঁধুনি-কাম-বডিগার্ড-কাম-ইয়ে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রীমান ষষ্ঠীচরণ-এর ইনপুট-সুদ্ধ 'ভয় পেয়ো না'-র সেই আজব চিজটিকে এই ধরা-র দুঙ্গি ল্যাবরেটরি-তে বানিয়েও ফেলেছিলেন। লোকটি, থুড়ি প্রোডাক্টটি, নাকি বেশ চলে-ফিরে, তানালাপ-কালালাপ ছেড়ে, ষষ্ঠীচরণ ভয় পাচ্ছিল বলে তার মাথায় ঠাঁই করে মুগুরের একটা বাড়ি মেরে, তারপর হঠাৎ সমুদ্রের দিকে হাঁটা দিয়েছিল। মানুষের মাথা, সিংহের পা, সজারু-র পিঠ (মশাই কাঁটাসুদ্ধ), ভালুকের লোম আর রামছাগলের শিং নিয়েও সে খামোকা জলে কেন গেল, এই রহস্যটাই কিছুতেই ভেদ করতে পারেননি বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর হিজিবিজবিজ। ওদিকে আবার শিং-থাবা-কাঁটাওলা 'ইয়ে'-টাকে কী নামে ডাকবেন, ভেবে উঠতে না-পেরে, তাকে পিল্লু ডাকতেও পারেননি। মুগুর হাতে লোকটাকে চট করে 'আপনি' বলবেন না 'তুমি', এরকম একটা বাঙালি-ভদ্রলোকি 'ডিলেমা'-ও হয়তো কাজ করে থাকবে, যেটা সত্যজিৎ লেখেননি!

যেটি কথা, আইডেন্টিটি-র একটা বিষম সমস্যাতেই বাঙালির এত বড় একটা আবিষ্কার এই সক্কা জলে গেল। 'আবোল তাবোল'-এর কবিতায় অবশ্য 'ভয় পেয়ো না'-র মুগুরধারীর আইডেন্টিটি নিয়ে খুব একটা ধোঁয়াশা নেই। ইনি ধড়ে-মুড়োয় একেবারে খাঁটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। যিনি শিঙে-মুগুরে-পাকানো চোখে নেটিভ উপনিবেশবাসীর ম্যালেরিয়া-জোলা পিলেটা সদাই চমকে রাখেন! আবার ও-দেশি গণতন্ত্রের লিবেরাল-মুখ (বা মুখোশটা) টিকঠাক রাখতে ভারতীয় নেতাদের লোক-দেখানো বাবা-বাছাও করতে হয়। ডেকে-ডেকে বলতে হয়:

'মাথায় আমার শিং দেখে তাই ভয়

পেয়েছ কতই না—

জানো না মোর মাথার ব্যারাম,

কাউকে আমি গুঁতোই না?'

বা 'মুগুর আমার হালকা এমন মারলে তোমায় লাগবে না' বলে দেশ জুড়ে প্রশাসনের বিকট জুলুমবাজি-টাও হালকা করে দেখাতে হয়।

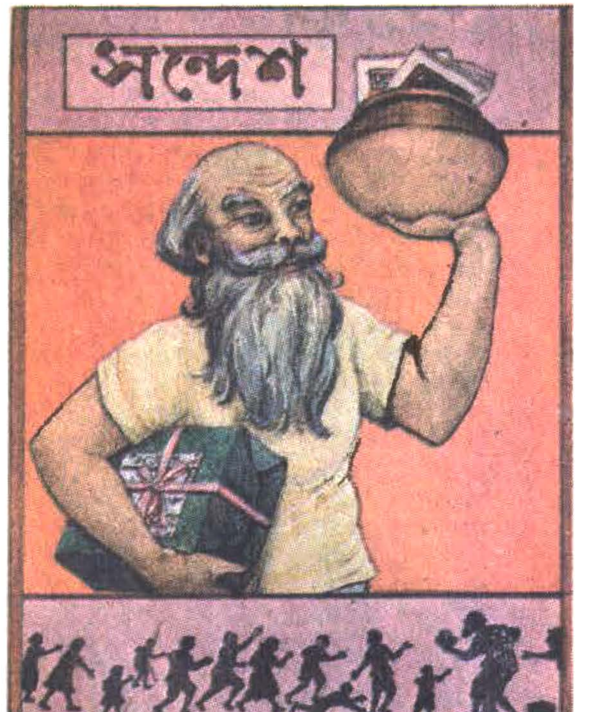
তারপরেও উপনিবেশের বেয়াড়া প্রজা কোড়পাঁই করলে, 'অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটো?' বলে কড়া হুমকি না-দিলেও চলে না। আসলে সাম্রাজ্যের ব্যাপারটা এইভাবেই চলে। তাই তাকে নিয়ে ঠাট্টার চালটাও যুগে-যুগে খুব একটা পাল্টায় না। 'ভয় পেয়ো না'-র ওই অভয়বাণী(!) তাই 'মারীচ সংবাদ'-এ 'মেরীবাবার গান'-এর লাইনে অন্য কায়দায় টুক করে ঢুকে পড়ে। 'চেতনা'-র এ-নাটকে 'মেরীবাবা' মানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, গানের মুখড়ায় 'আমি প্রেম বিলোতে এসেছি' গোছের কিছুর বৈষ্ণব বালাইপালাই সেরে, অন্তরায় এসে কাঠাভিলক ছেড়ে, আসলি দাঁত-নখ বার করে ফ্যালে। আর তক্ষুনি 'বল প্রেম নিবি কি না' জাতীয় 'মেরীবাবা'-র খোলাখুলি ধমকির সঙ্গে 'অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে'-র হুমকিটা খাপে-খাপ মিলে যায়।

অবশ্য না-মিলে উপায়ও নেই। কারণ ছন্দে-মিলে স্যাটায়ার-এর হুক-জ্যাব-আপারকাট বা নকআউট পাঞ্চ ঝাড়ার কায়দাটা সুকুমার রায়ের চেয়ে ভাল বাংলা ভাষায় আর কেউ কখনও রপ্ত করতে পারেননি। আর সে এমনই কায়দা যে, প্রতিপক্ষ নকআউট হয়ে যাওয়ার পরেও বুঝতে পারে না, তার পা আসলে মাটিতেই নেই। কারণ ধড়ে-মুড়ো সন্ধির মতোই সুকুমার মিঠের সঙ্গে কড়া, মোলায়েমের সঙ্গে খোঁচা, খাঁটি ননসেন্স-এর সঙ্গে গহন কবিতাকে বেমালুম

মেলাতে পারেন। তাঁর চেনাশোনা সমাজের ট্যাশগরু, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, কুমড়োপটাশ কিংবা রামগরুড়ের ছানাদের তিনি ননসেন্স-এর উঠোনে নামিয়ে, স্যাটায়ারের ধুনুর-এ একদম তুলো ধুনে দিতে পারেন। 'রামগরুড়ের বাসা' যে আসলে কোথায়, সে তো ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা সভায় গেলেই টের পাওয়া যেত। চোগা-চাপকান-দাড়ি প্যাশনে আর গাম্ভীর্য-আঁটা। ভয়ানক শালীন পিউরিটান, রক্ষণশীলতার ধমক-ঠাসা সেই মহলে হাসি যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ, সেটা নোটিস দিয়ে টাঙানো না-থাকলেও বোঝা যায়। আর নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার মানব-বাসনার জোড়া ল্যাজের ডায়ালেকটিক্স সামলাতে-সামলাতে সেখানকার হুঁকোমুখো হ্যাংল্য-দের মুখের হাসি যে মুছে গিয়েছে, সেটাও তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই সময়ের সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য-বিবরণীতে সুকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে প্রবীণ গোষ্ঠী বা সমাজপতিদের একাধিক ফাটাফাটি ঝামেলার যা তথ্য রয়েছে, সেসব হাতড়ালেই 'রামগরুড়' বা 'হুঁকোমুখো'-দের ঠিকানার হদিশ মিলে যাবে।

কিন্তু তাই বলে তাঁরা কি আর সুকুমারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠুকতে গিয়েছেন? 'একুশে আইন' কবিতায় তিনি তো পরিষ্কার ইংরেজ সরকারের কালাকানুন-কে একুশ পাক ঘুরিয়ে, একুশবার ওঠবোস করিয়ে, একুশ দফা সেলাম ঠুকিয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু সিডিশন-এর অভিযোগ এনে সরকার তো তাকে খাঁচায় পুরতে পারেনি। এটাই সুকুমার রায়ের খেলা। আর সেই খেলাটায় তিনি 'চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্‌স'—যেজন্য জীবনানন্দ দাশ-বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে আজকের কবি-গীতিকার কবীর সুমন অবধি তাঁকে টুপি খুলে কুর্নিশ করতে বাধ্য। তিনি 'অসম্ভবের ছন্দেতে' যে খেয়ালরসের দুনিয়া টুসকিতে গড়েন জীবনানন্দের চোখে 'তা মোটেই আমাদের চেনাজানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতিচ্ছবির মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য।' আর এখানটাতেই এডওয়ার্ড লিয়র আর লিউইস ক্যারল-এর সঙ্গে সুকুমার রায়ের তফাতটা তৈরি হয়ে যায়।

সুকুমারকে নিয়ে যে কোনও অ্যাকাডেমিক চর্চায় লিয়র আর ক্যারল-এর সঙ্গে তাঁর তুলনাটা আসবেই আসবে। লিয়র-এর লিমেরিক-এর দুনিয়ার সঙ্গে সুকুমারের 'আবোল তাবোল', বা লুইস ক্যারল-এর 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর সঙ্গে 'হযবরল'-র কোথায় কতটা মিল বা অমিল, তাই নিয়ে রীতিমতো মাথা-ঘামাঘামিও চলে। আমরা শুনেছি, ইংরেজ সুররিয়ালিস্ট কবিরা অনেকেই টেনিসন-এর চেয়েও লিয়র-কে বড় কবি বলে মনে করতেন। কারণটা খুব সোজা। শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় লিয়র-এর লিমেরিক-এ যুক্তি-নিয়মের যান্ত্রিক শৃঙ্খলা ভাঙার যে স্পর্ধা ছিল—চেনা রিয়েলিটি-কে পেরিয়ে উদ্ভট-আজগুবি একটা জগৎ আবিষ্কারের যে উত্তেজনা ছিল—সুররিয়ালিস্ট-রা নিজেদের



ভাবনার সঙ্গে তার একটা মিল পাচ্ছিলেন। অ্যালিসের আজব দেশের ঠিকানাটাও লিয়র-এর ননসেন্স-এর দুনিয়ার খুব কাছাকাছি। ওখানেও 'খুল যা সিম সিম'-এর মতো কোন অ-লৌকিক মন্ত্রের ছোঁয়ায় পরতে-পরতে খুলে যাচ্ছিল এক জাদুনগরীর সিং-দরজা, বারমহল, অন্দরমহল—চেনা-বোঝা-জানা যুক্তির ফিতেয় যার দিশে পাওয়া ভার। ওখানেও চেনা পৃথিবী, চেনা সময় নিয়ে ঠাট্টা আছে ষোলো আনা। কিন্তু 'দ্যাখো তোমার নিয়ম ভাঙছি'—এই দেখনদারিটা আছে ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা!

মানুষের ভাবজগতে বাজার আর শিল্পপুঁজির দখলদারি কায়েমের মুখোমুখি লড়াইটা লড়ার জন্য ক্যারল বা লিয়র-এর পক্ষে হয়তো এটাই জরুরি ছিল। কিন্তু সুকুমার রায়ের দেশকালের প্রেক্ষিতটা তো একদম আলাদা। সুকুমারের সামনাসামনি কোনও প্রবল পরাক্রান্ত শিল্পবিপ্লব-টিপ্লব ছিল না। বরং ঘাড়ের ওপর

ফেলেছিল ঔপনিবেশিক শাসন আর একটা আধখাঁচড়া, দমবন্ধ, বাঙালির ভদ্রকথিত নবজাগরণের ভূত: সুকুমার তাই 'আবোল তাবোল'-এর ভূমিকা-কবিতাটিতে যতই খেয়াল-খোলা, সৃষ্টিছাড়া, বেয়াড়াপনাকে ডাকুন না কেন, তাঁর ওই 'আজগুবি চাল' কিন্তু মোটেই 'বেঠিক বেতাল' নয়। 'আবোল তাবোল'-এর যতরকম 'অনাসৃষ্টি', তার কোনওটাই আসলে খোশখেয়ালিক 'নিয়মহারা হিসাবহীন' নয়। বরং প্রত্যেকটা শব্দই অনেক কেটে-কুটে ঘষে-মেজে ঝেড়ে-বেছে বসানো হয়েছে। 'আবোল তাবোল'-এর পাণ্ডুলিপির ফ্যাক্সিমিলি এডিশন দেখলেই পাঠকদের সেটা মালুম হবে। কল্পনার হিস্টিরিয়াকে তিনি কখনওই মগজ অবধি চড়তে দেননি। কারণ চড়তে দিলেই তো সেটা ঢোঁ করে হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি-সময়-সমাজ সব গুলিয়ে ঘেঁটে ঘ করে দেবে।

অথচ সুকুমার তো মোটেই সব কিছু গুলোতে চাননি। 'আবোল তাবোল' কথার কুয়াশায় শুধু তাঁর টার্গেটগুলোকে একটু আবছা করে দেখাতে চেয়েছিলেন। তাতে তাকও ফসকায় না, টার্গেট-ও টসকায় না—কিন্তু তার রোয়াবিটা টেঁপো মাথার মতো টিপে-টুপে একটু টাল খেয়ে যায়। আর যে বোঝার, সে ঠিক বুঝে মজা পায়। যেমন ট্যাঁশ গরু যে গরু নয়, 'আসলেতে পাখি সে' সে তো হারুদের আপিসে না গেলেও জানা যায়। কিন্তু ওই ওপরের আসলের জাতি-এর নীচে যে কালোচুলো টেরিকাটা আরেকটা 'আসল' ঘাপটি মেরে বসে আছে, তাকে চিনব কী করে? খুব সোজা। বাঙালি যা খায়, তা সে ছোঁয় না। শুধু ছোঁয় না নয়, অমন সয় না। খেলেই 'তার কাশি ওঠে খকখক/সারা গায়ে ঘিনঘিন ঠ্যাং কাঁপে ঠকঠক'। বাংলা খানা, বাংলা গানা, বাংলা বই, বাংলা জানা—সবটাই যাদের কাছে 'হরিবল', 'অফুল', 'ডিসগাস্টিং'—এমনি ভয়ানক সাহেব-চাটা, ইঙ্গ-বঙ্গ, টাশ-ফিরিঙ্গি সেই সুকুমার রায়ের আমল থেকে আজকের জমানা অবধি এ পোড়া বঙ্গদেশে নেহাত দয়া করে তাদের বং-কানেকশন টিকিয়ে রেখেছে। 'ট্যাঁশ গরু' শুধু তাদের চিনিয়ে দিয়েছে।

আইডেন্টিটি ক্রাইসিস অবশ্য আছে। ট্যাঁশ গরু যেমন গরু নয়, তেমনি 'কিম্ভূত'-ও তো 'কেউ নয়': সব কিছু একসঙ্গে হতে চেয়ে শেষ অবধি আকাশের বাইরে-র সে যেটা হল, তাকে তো যে কেউ মুখের ওপরে ডেকে দেবে—'কোথাকার তুই কে রে, নাম নেই ধাম নেই?' আর শেষের চার লাইনে 'কিম্ভূত'-এর একলা মনস্তাপের তো তুলনা হয় না—

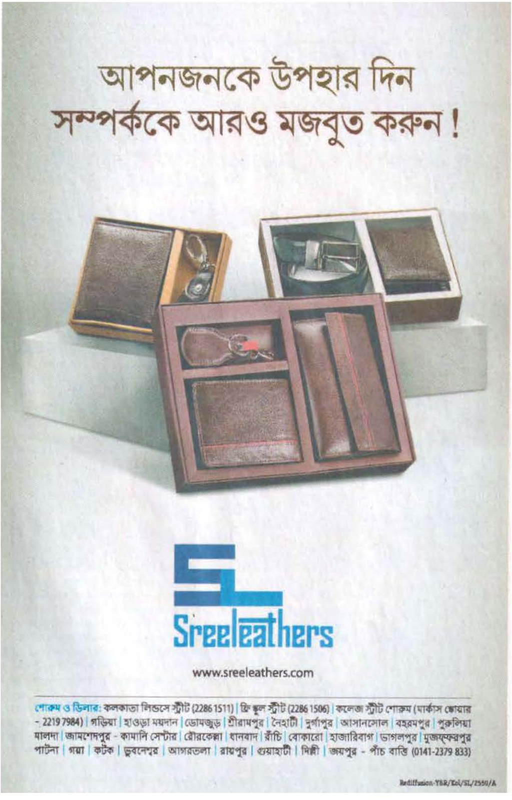
নেই ঘোড়া, নেই হাতি, নেই সাপ বিচ্ছু,/মৌমাছি প্রজাপতি নেই আমি কিচ্ছু!/মাছ ব্যাঙ গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,/নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই'। সুকুমার তো এখানে ভান করেও ননসেন্স-এর ধারে-কাছে ঘেঁষছেন না। বরং চোস্ত-চেরা-কাটছাঁট-শানানো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বাঙালির সর্ববিদ্যাবিশারদ সাজার জাত ফোঁড় করছেন।

কেউ-কেউ বাংলা ভাষার সুকুমার-সাহিত্য-ফেরতা প্রায় শ'খানেক প্রবচনের লিস্টি যে কোনও সময় কড়াক্রমে নামিয়ে দিতে পারেন। 'হাঁসজারু', 'খুড়োর কল', 'একুশে আইন', 'সৎপাত্র', 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি', 'গানের গুঁতো'—কয়েক সেকেন্ডে আপনিও হয়ত গোটা দশেক আউড়ে দেবেন। পপুলার ব্র্যান্ড হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'গেছো-বাবা'-কে কয়েকশো মাইল পেছনে ফেলবেই 'হযবরল'-র 'গেছোদাদা'। এর মধ্যেই কোনও কোনওটা তুখোড় রাজনৈতিক। যেমন 'লড়াই-ক্ষ্যাপা'-র পাগলা জগাই। যুদ্ধ নিয়ে এমন মানসিক রঙ্গ, চার্লি চ্যাপলিন ছাড়া আর কেউ করেছেন কি না বলা কঠিন। 'সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে'—দেশ-বিদেশের যে কোনও যুদ্ধের গল্প-ই, একলা বীরত্ব বা ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের এমন কয়েকশো কথা ও কাহিনিতে ভর্তি। আর সুকুমার তা নিয়ে ঠাট্টাটাও করছেন ফাটিয়ে। সন্দেশ-এ 'লড়াই-ক্ষ্যাপা', ছাপা হওয়ার পরপরই 'বিলেতে শিখসেনা' নামে একটি পত্ররচনাও ছাপা হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার বাবাকে লেখা এক শিখসেনার চিঠি। কৌতুকের আড়ে আর ব্যঙ্গের ধারে সে এক অভিজ্ঞতা: 'তারপর অসংখ্য জার্মান আসিল। আমরা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলাম।... রাত্রে তাহারা আবার আসিয়া বিজলীতে আসমান জ্বালাইয়া ফেলিল...আমরা আবার তাহাদের সকলকে মারিয়া ফেলিলাম।...সেখানে একটা গাছ আছে, সেই গাছে হরেক জাতের সিপাহির টুকরো বোমার চোটে হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া ঝুলিতে থাকে। হিন্দুস্থানী পাগড়ি আর সাহেবদের টুপী আর বুট সব সেখানে আছে।' কী মনে হচ্ছে? যুদ্ধ ব্যাপারটাকেই তো এখানে (রীতিমতো সজ্ঞানেই) আস্ত একটা 'ননসেন্স' বানিয়ে দিয়েছেন 'সন্দেশ'-সম্পাদক। 'লড়াই-ক্ষ্যাপা' যুদ্ধ-পনাকে এটার সঙ্গে একটু মিলিয়ে পড়ুন। পাগলা জগাই প্রথমে বলছে, 'জগাই মোলো হঠাৎ খেয়ে কামানের এক গোলা'। এই না বলে, মিনিটখানেক ছটফটিয়ে জগাই মড়া সেজে শুয়ে থাকছে। তারপরেই যাকে বলে মাইন্ড চেঞ্জ করে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে স্লোগান(!) লিখে দিচ্ছে, 'শোন রে জগাই, জীবন লড়াই হল/পাঁচ ব্যাটাকে খতম করে জগাইদাদা মোলো'।

আসলে বীর শহিদের মর্যাদা পাগলেও বোঝে। পাঁচ ব্যাটাকে খতম করে প্রাণ দেওয়ার যে মাহাত্ম্য, পেঁচো সিপাহিদের মতো এক গোলায় নিকেশ হয়ে গিয়ে তো আর সেই 'এক্সপোজার' মিলবে না। মালা-গান স্যালুট-শহিদ বেদি-টেদিও হবে না। ফলে পাগলা জগাই-কে 'স্টোরি' পাল্টে বীরত্বের 'ইনপুট' ঢোকাতে হয়। তাই 'লড়াই-ক্ষ্যাপা' প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ যখন লেখেন, 'এর কৌতুকটা সমালোচনার দিকে ততটা নয়, যতটা আগ্রহ কেবল মজাদার এই আচরণগুলোকে সাজিয়ে দেখার দিকে'—তখন বোধহয় পুরোটা ঠিক বলা হয় না। বরং সুকুমারের রাজনৈতিক ব্যঙ্গের 'কোপ', যুদ্ধ নামের পাগলামির ফুটো কলসিটা উপুড় করে দিয়ে, 'বাবুরাম সাপুড়ে'-র দিকে ধড়মড়িয়ে ধেয়ে যায়। শাসক ইংরেজের সাম্রাজ্যের মূর্তি যখন ক্রমশই রাগী আর রক্তখেকো চেহারা নিচ্ছে, তখন 'রাজভক্ত'-মার্কা বনেদি অ্যারিস্টোক্র্যাটদের মহামহিম ইংরেজ সরকারের শ্রীচরণে সমর্পিত আর্জি-পর-আর্জি লেখা, তাঁদের মডারেট-নরমপন্থী রাজনীতিকে ঢোঁড়া সাপের চেয়েও নির্বিষ ছাড়া আর কীই-বা মনে হতে পারে! 'যে সাপের চোখ নেই, শিং নেই, নোখ নেই!/ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,/করে নাকো ফোঁসফাঁস, মারে নাকো ঢুঁশঢাঁশ,/নেই কোনও উৎপাত, খায় শুধু দুধভাত—' এই লাইনগুলো লিখতে বসে সুকুমার কখনওই শব্দ নিয়ে হাসি-মজার জোকারগিরি হয়ে থাকতে চাইছেন না। বরং কৌলীন্য-ভিক্ষায় অন্ধতাহীন দুধু-ভাতু, কাঁচুমাচু নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রাগ আর বিতৃষ্ণা পুরোটাই উগরে দিচ্ছেন। নিরীহ-সাহেবের সঙ্গে এখানেও প্রাচ্যের ঔপনিবেশবাদী, নেটিভ-কবির চিত্তজগতের বড়সড় ফারাক ঘটে যাচ্ছে।

সুকুমার তাই চাইলেও 'এই দুনিয়ার সকল ভাল...তুমিও ভাল আমিও ভাল' বলতে পারছেন না। বা 'শেকহ্যান্ড আর দাদা বল/সব শোধবোধ ঘরে চল' বলে পুরো ঝগড়াটা মিটিয়েও দিতে পারছেন না। 'হযবরল'-র বিচারসভায় শেষ সাক্ষী কাকেশ্বর যখন আইন করে সবার মুখোশ টেনে খুলে দিচ্ছিল—দুই উকিল শেয়ালকে 'তেলাচোরা' আর কুমিরকে 'অষ্টাবক্র' এবং মহান বিচারপতি প্যাঁচাকে সটান 'নির্বাক'-ও বলে দিয়েছিল, তখনই সভায় ভয়ানক গোল বাধিয়ে, সব লন্ডভন্ড করে দেওয়া হয়। খেলার বাকিটাও ভেস্তে যায়। ওদিকে অসুস্থ সুকুমারের যুদ্ধের জোরও ক্রমশই ফুরিয়ে আসছিল। গানের পালা সাঙ্গ না-করেই, তাঁকে মাঝপথে চলে যেতে হয়েছিল। তাই বেড়ালের 'তালব্য শ'-টা তিনি শেষ অবধি খুঁজে দিয়ে যেতে পারেননি। অথচ এই সময়—চারপাশ-সমাজ-রাজনীতিকে আলাদা চোখে দেখার, অসংগতিগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চশমাটা তো রেখে গিয়েছেন। ওই তালব্য শ-টাকে খুঁজে পেতে, চশমা না আঁটলেও চলবে। কিন্তু বোধটা চালু রাখতে হবে। তা হলেই একালের অনেক 'কুমড়োপটাশ' বা 'বোম্বাগড়ের রাজা'-দের ধরে ফেলা যাবে। আর প্যাঁচার মতো সব জজসাহেবদের চোখের ব্যারামটাও সারিয়ে ফেলা যাবে।

ঋণ : 'কল্পনার হিস্টিরিয়া', শঙ্খ ঘোষ



আপনজনকে উপহার দিন
সম্পর্ককে আরও মজবুত করুন !
Sreeleathers
www.sreeleathers.com
শোরুম ও ডিলার: কলকাতা লিন্ডসে স্ট্রীট (2286 1511) | ফ্রি স্কুল স্ট্রীট (2286 1506) | কলেজ স্ট্রীট শোরুম (মার্কাস স্কোয়ার - 2219 7984) | গড়িয়া | হাওড়া ময়দান | ডোমজুড় | শ্রীরামপুর | নৈহাটী | দুর্গাপুর | আসানসোল | বহরমপুর | পুরুলিয়া মালদা | জামশেদপুর - কামানি সেন্টার | রৌরকেল্লা | ধানবাদ | রাঁচি | বোকারো | হাজারিবাগ | ভাগলপুর | মুজফ্ফরপুর পাটনা | গয়া | কটক | ভুবনেশ্বর | আগরতলা | রায়পুর | গুয়াহাটী | দিল্লী | জয়পুর - পাঁচ বাত্তি (0141-2379 833)
Rediffusion-Y&R/Kol/SL/2550/A

শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তিশেল

গাম্ভীর্য আর পণ্ডিতি, দু'টোই ঘোরতর অপছন্দ ছিল সুকুমারের। তাঁর নাটকে ঘুরে-ফিরে এসেছে সেই চরিত্রগুলো, যারা আদতে আকাট মূর্খ, নির্বোধ, নির্লজ্জ সুযোগসন্ধানী, অথচ দুরারোগ্য পণ্ডিতম্মন্যতায় ভোগে।



তাতাবাবুর ছেলে মানিকবাবু যখনই ফেলুবাবু-কে নিয়ে ছবি বানিয়েছেন, সুযোগ পেলেই বাবার লেখা থেকে সংলাপ ধার করেছেন। সে 'সোনার কেল্লা'-র প্রদোষ সি মিত্তির-এর ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, কোমর ২৬ ইঞ্চি শুনে লালমোহনবাবুর 'মশাই আপনি কি পুরোনো?' বলে অট্টহাস্যে ফেটে পড়াই হোক, অথবা 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ শশীবাবু খুন হওয়ার ঠিক আগে বেনারসের গলিতে ফেলুদার গলায় 'সন্তুক ধরে ওরে ও ভাই সজারু'-র গা ছমছমে আবহ-ই হোক। হয়তো কিছুই না, স্রেফ বাবার প্রতি এক ধরনের ট্রিবিউট হিসেবে এগুলো ব্যবহার করেছেন সত্যজিৎ রায়। যেমন 'পরশপাথর'-এ 'হলদে সবুজ ওরাং ওটাং'। আবার এ-ও হতে পারে যে, সুকুমার রায়ের মজাদার কথাগুলোর বাইরে তার যে ব্যঞ্জনা, তার অন্তর্গত ব্যবহারে যে শাণিত ইস্পাতের ঝলক, যে নাটকীয়তা—তার লোভ সামলাতে পারেননি সত্যজিৎ রায়। বন্দুক উঁচিয়ে ফেলুদা যখন কোণঠাসা মন্দার বোসকে বলে 'আপনার কী শাস্তি হওয়া উচিত জানেন তো, তিন মাসের জেল আর সাত দিনের ফাঁসি'—তখন 'হযবরল'-র মজাটা আদৌ থাকে না, বরং অপরাধ আর তার শাস্তির গুরুত্বটা চট করে বোঝা হয়ে যায়।

সুকুমার রায়ের লেখা সেরা নাটক বোধহয় 'হযবরল', যেটা তিনি আদৌ নাটক হিসেবে লেখেননি। অথচ রুমালটা বিড়াল হয়ে যাওয়ার পর থেকে একের-পর-এক চরিত্ররা যেভাবে আসতে থাকে এবং যে ধুন্ধুমার নাটকীয়তা থাকে তাদের প্রতিটি সংলাপে, একেকটা দৃশ্য যে দ্রুততার সঙ্গে নির্মিত হয় এবং যে মসৃণতা নিয়ে তারা মিশে যায় পরবর্তী দৃশ্যে—'হযবরল'-কে নাটক ছাড়া কিছু ভাবতেই ইচ্ছে করে না। আর যে নিপুণ কলমের আঁচড়ে, যে মিতব্যয়ে একেকটি চরিত্র আঁকেন সুকুমার, নাটক ছাড়া কোনও কিছুতে সেটা হওয়ারই কথা নয়। আদালতে মামলা চলছে, জজসাহেব ঘুমোচ্ছেন। সাক্ষী দিতে উঠে হিজিবিজবিজ্ বলল, সব আদালতেই একজন জজ থাকে, সে বসে-বসে ঘুমোয়। প্যাঁচা তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'কক্ষনো আমি ঘুমোচ্ছি না—আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।' সেই শুনে হিজিবিজবিজ্ বলল, 'আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম'। এমন তুখোড় চাপান-উতোর যে প্রহসন ছাড়া অন্য কিছুতে ভাবাই যায় না। হতে পারে যে সত্যজিৎ রায়মশাইয়েরও এমনই কিছু মনে হয়েছিল, ফলে 'হযবরল'-র সংলাপ সুযোগ পেলেই ফিরে এসেছে তাঁর ছবিতে।

সুকুমার রায়ের লেখালেখির শুরু কিন্তু নাটক দিয়েই। স্কুলে থাকতে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত এক কিশোর পত্রিকায় দুটি ছোট লেখা যদিও প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর কলেজ ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যেই 'ননসেন্স ক্লাব'-এর পত্তন এবং সে-ক্লাবের সদস্য আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য লেখা দুটি নাটক 'ঝালাপালা' এবং 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-ই সাবালক সুকুমারের প্রথম লেখা। এরপরও অন্যান্য নানা ধরনের লেখালেখির ফাঁকে বিক্ষিপ্তভাবে নাটক লিখেছেন। ছোটদের জন্য লিখেছেন 'অবাক জলপান' ও 'মিউ' গোত্রের নাটিকা 'মামা গো'। এ ছাড়া 'হিংসুটি', যে নাটিকার আয়তন, গড়ন এবং উপস্থাপনা দেখে মনে হয় সম্ভবত কোনও ঘরোয়া অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে লেখা। ঠিক কিশোরপাঠ্য নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যই লেখা নাটক মাত্র তিনটি এবং তিনটিই বাক্চাতুর্যে অসাধারণ। 'ভাবুক সভা', 'চলচিত্ত-চঞ্চরি' এবং 'শ্রীশ্রী শব্দকল্পদ্রুম'।

তবে কেন যেন মনে হয়, সুকুমার রায় নাটক লেখাটাকে খুব সিরিয়াসলি নেননি। অবশ্য সিরিয়াস হওয়ার আর সময় পেলেন কোথায়! বাঁচলেনই তো মোটে ৩৭টা বছর। আবার এ-ও ঠিক যে, ওটাই ছিল তাঁর সিরিয়াসনেস-এর ধরন। খুব শক্ত কথাগুলোও হালকা চালে বলে দেওয়া। কারণ, গাম্ভীর্য আর পণ্ডিতি, দু'টোই ঘোরতর অপছন্দ ছিল সুকুমারের। তাঁর নাটকে ঘুরে-ফিরে এসেছে সেই চরিত্রগুলো, যারা আদতে একেবারেই আকাট মূর্খ, নির্বোধ আর নির্লজ্জ সুযোগসন্ধানী, অথচ দুরারোগ্য পণ্ডিতম্মন্যতায় ভোগে। এসেছে 'হযবরল'-র ন্যাড়ার মতো স্বঘোষিত প্রতিভারা, যারা গায়ে পড়ে বলে, 'না ভাই, আজ আমায় তোমরা কেউ গাইতে বোলো না।' কী আপদ, গাইতে বলছে কে! কিন্তু তবু এরা কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে

যায়, 'না ভাই, গাইতে বোল না।' এদের কেউ ন্যাড়ার মতোই বেসুরো বেতালা গান গায়, কেউ শ্রীযুক্ত ভবদুলালের 'চলচিত্ত-চঞ্চরি'-র মতো অন্তঃসারশূন্য অথচ বাকচাতুর্যসর্বস্ব একখানা বই লিখে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে। সেই বই যদিও নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়, কারণ, ততোধিক অর্থহীন, প্রায় প্রলাপসর্বস্ব পণ্ডিতি থেকে ধার করে, চুরি করে, টুকে লেখা। পল্লবগ্রাহিতার অপূর্ব নমুনা সেই 'চলচিত্ত-চঞ্চরি' যতই ফোঁপরা হোক, সেটা যে ডবল ডিমাই বাঁধানো, ৭০০ কি ৮০০ পাতার একখানা বই হবে, তার দাম যে অন্তত সাড়ে তিন টাকা হবে, সেটা ভবদুলাল আগেই স্থির করে রেখেছেন। বই লেখার আগেই তদ্বির শুরু করে দিয়েছেন যাতে লাইব্রেরিতে তার এক কপি রাখা হয়। শুধু বইয়ের নামটা বলতে গিয়েই বারবার গুবলেট হয়ে যায়।

সত্যবাহন : তুমি কী পড়ছ হে ছোকরা?

ছাত্র : শব্দার্থ-খণ্ডিকা, আয়স্কন্ধ-পদ্ধতি, লোকাষ্টপ্রকরণ, সিন্রেকস কসমোপিডিয়া, পাল্স এক্সট্রা সাইক্লিক ইকুইলিব্রিয়াম অ্যান্ড দ্য নেগেটিভ জিরো...


'সূর্যাস্তের গঙ্গা'। শিল্পী সুকুমার রায়

সত্যবাহন : থাক, থাক, আর বলতে হবে না। দেখুন, অত বেশি পড়িয়ে কিছু লাভ হয় না। আমি দেখেছি ভাল বই খান-দুই হলেই এদিককার শিক্ষা সব একরকম হয়ে যায়।

ভবদুলাল : আমার 'চলচিত্ত-চঞ্চরি' বইখানা আপনার লাইব্রেরিতে রাখেন না কেন?

শ্রীখণ্ড : বেশ তো, দিন না এক কপি।

ভবদুলাল : আজ্ঞা, দেব এখন। ওটা হয়েছে কী, বইটা এখনও বেরয়নি। মানে খুব বড় বই হচ্ছে কিনা, অনেক সময় লাগবে। কোথায় ছাপতে দিই বলুন তো?

শ্রীখণ্ড : ও, এখনও ছাপতে দেননি বুঝি?

ভবদুলাল : না, এই লেখা হলেই ছাপতে দেব। আগে একটা ভূমিকা লিখতে হবে তো? সেটি কীরকম লিখব তাই ভাবছি! খুব বড় বই হবে কিনা।

শ্রীখণ্ড : কী নাম বললেন বইখানার?

ভবদুলাল : কী নাম বললাম? চলচঞ্চল, কি না? দেখুন তো মশাই, সব ঘুলিয়ে দিলেন—এমন সুন্দর নামটা ভেবেছিলাম।

(চলচিত্ত-চঞ্চরি)

এই ভবদুলালের বিশেষ গুণ, তিনি বুঝুন বা না-বুঝুন, সব বিষয়ে মন্তব্য করেন। তাতে অবশ্য তাঁর ভিতর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এবং তিনি যাঁদের সঙ্গে সমাজে ওঠা-বসা করে জাতে উঠতে চান, তাঁদেরও পরিষ্কার চেনা যায়।

সত্যবাহন : যাক, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, বাইরের জিনিস যেমন মানুষের ভেতরে ধরা পড়ে, তেমনই ভেতরের জিনিসও সময়-সময় বাইরে প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে আমরা অন্তরঙ্গভাবে যেসব জিনিস পাচ্ছি সেগুলোকে এখন বাইরে প্রকাশ করা দরকার।

ভবদুলাল : ঠিক বলেছেন। এই মনে করুন যে, কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাটির রস খেয়ে বাড়ে, সেই কেঁচোই আবার মাটির রস খেয়ে বাইরে চলে আসে।

সকলে : (মহোৎসাহে) চমৎকার! চমৎকার!

(চলচিত্ত-চঞ্চরি)

সমস্যা হচ্ছে, এই বিদগ্ধ বাক্যালাপ শোনার পর যতবার আপনি ইম্প্রেশনিজ্‌ম আর এক্সপ্রেশনিজ্‌ম-এর কথা ভাববেন, ততবার ভবদুলালবাবুর কেঁচোদের কথা আপনার মনে পড়ে যাবে। সুকুমার রায়ের 'চলচিত্ত-চঞ্চরি', 'ঝালাপালা' আর 'শব্দকল্পদ্রুম'—তিনটি নাটকেরই মূল স্রোত এটাই। এই ছদ্ম পণ্ডিতি আর মিথ্যে বাগাড়ম্বরের কেন্দ্রীয় বিষয়টাকে ধরে সব কিছু ঘুলিয়ে দেওয়া। এতে একটা অসুবিধে হয় যে, মনে হয় নাটকটা একটা জায়গাতেই আটকে আছে। একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু এক পা-ও এগোচ্ছে না, এবং শেষ পর্যন্ত কোথাও পৌঁছচ্ছে না। সাধারণভাবে নাটকের শর্ত মেনে চললে এটা হয় না, বা হলেও, সেটা ভাল নাটক হয়ে ওঠে না।

আসলে সুকুমার রায় সম্ভবত কখনওই নাটকের শর্ত মেনে, নাটকীয়তা বজায় রাখার আবশ্যিক লাইফ-লাইন ধরে নাটক



লেখার পথে হাঁটেননি। যদিও বিষয়টা যে তিনি বুঝতেন এবং নিঃসন্দেহে অতীব জোরদার দখল ছিল তাঁর, সেটা বোঝা যায় একটিমাত্র নাটকে। 'অবাক জলপান'। নাটকের সূত্র মেনেই এ নাটক লেখা, একটা সমস্যা তৈরি করা এবং সেই সমস্যাকে একেবারে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে দিয়ে তার একটা সমাধান। যদিও সমস্যাটা নিপীড়িত কৃষক বা শোষিত শ্রমিকের জীবনসংগ্রাম জাতীয় কোনও গুরুগম্ভীর জটিল ব্যাপার নয়, বরং খুবই সাদামাটা। একটা লোক প্রচণ্ড গরমে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে এবং সে একটু জল খেতে চায়। 'একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?'—এই সরল প্রশ্নটা দিয়ে সমস্যাটার শুরু। ঝাঁকা মাথায় ব্যাপারি, ভাব-জগতের বৃদ্ধ, উঠতি কবি, বহু ঘাট ঘুরে সেই পথিক গিয়ে পড়ে খামার এক পণ্ডিতের কাছে। (সত্যিই পণ্ডিতদের ব্যাপারে নির্মম ছিলেন সুকুমার!) তেষ্টায় ছাতি-ফাটতে-বসা লোকটার (এবং নাটকেরও) সমস্যা একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছয়, যখন বৈজ্ঞানিক মামা বোঝাতে বসেন, খাওয়ার জল কাকে বলে!

'অবাক জলপান' যদিও শেষ হয় নেহাতই হাঁফ ছাড়া খুশির মধ্যে দিয়ে যে, যাক বাবা, লোকটা শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি করে এক গ্লাস জল আনিয়ে খেতে পারল! কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে, এমন তো কত হয় যে মানুষের খুব সহজ, সরল, সাদাসিধে কথাগুলো বুঝে উঠতে পারেন না বিশেষজ্ঞরাই বা বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা সব সময় নিজের কথা বলতেই ব্যস্ত থাকেন, অন্যের সমস্যা বোঝার চেষ্টাও করেন না। এই সংকটগুলো থেকেও তো চরম নাটকীয়তা তৈরি হয়। যে কৃষক বলেন যে, বাপ-ঠাকুরদার চাষের জমি তিনি হাতছাড়া করবেন না, তাঁর আত্মিক সংকটের হদিশ কেউ পায় না। প্রশাসকরা নিজেদের কথাই কেবল বলে চলে। চাষের জমিতে শিল্প হবে, হ্যানা হবে ত্যানা হবে, তবেই নাকি চাষির ভাল হবে। বোঝাতে পারা যায় না যে, আসলে সাধারণ ছাপোষা লোকেদের চাহিদা খুব অল্প। 'অবাক জলপান' পড়লে মনে হয়, সুকুমার রায় চাইলেই ননসেন্সের বাইরে গিয়ে চমৎকার 'সিরিয়াস' নাটক লিখতে পারতেন। সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে, সংকট নিয়ে। এমনকী হয়তো সেই সব দুরূহ বিষয় নিয়েও, যেগুলো সচরাচর নাট্যকাররা ধরেন না। এবং সুকুমার রায়ই পারতেন। কারণ যে-দরদ দিয়ে তিনি ছোটদের জন্য বিখ্যাত মানুষদের জীবনী থেকে শুরু করে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা বিচিত্র প্রাণিজগৎ নিয়ে সহজ ভাষায় লিখে গিয়েছেন, সিরিয়াস নাটকে ওই সহজ ভাষাটার খুব দরকার ছিল। যে-ভাষা বিষয়ের গুরুত্বে ভারাক্রান্ত নয়, কিন্তু বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় মর্মভেদী। কিন্তু মাত্র ৩৭ বছরে অত কিছু করে ওঁর সময়টাই পাননি বোধহয়।

তার মধ্যেই অবশ্য সুকুমার রায় লিখে গিয়েছেন 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এর মতো নির্ভেজাল মজার নাটক। এ নাটকের চলনটাই অনাড়ম্বর। প্রথমত, কোরাসের ব্যবহার। এমনিতেই প্রায় সব নাটকেই প্রচুর গান রেখেছেন সুকুমার রায়। যদিও সব গান যে খুব ভাল বা, সুপ্রযুক্ত, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ সমবেত গান সংলাপের বিকল্প হয়ে ওঠে সুযোগ পেলেই। সুগ্রীবের সঙ্গে রাবণের লড়াইয়ের আগে গোটা আস্ফালনটাই গানে গানে। আর যে সে গান নয়, রীতিমতো রাগসংগীত!

সুগ্রীব : হবে রে রাবণ ফাটা
তোর মুখে মারব ঝাঁটা
তোকে এখন রাখবে কেটা বল।
(তোর) মুণ্ডের দুর্গতি যত
করিব কালো ভূত
তোর এখনি হবে দফারফা
আয় রে আমি বলো যদি চল্।।
রাবণ : ওরে পাষণ্ড, তোর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড
করিব
কত শক্তি ধরে, বলে দেখাব,
এখনি অবজ্ঞ মর্দিব
ব্যাটা ওলিখোর বুদ্ধি নেই তোর
লেজেতেই বুঝি মাথা
আয় তবে আয় ঘাঁটিশ দাও করিব
তোরে পাতো।

(লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

এভাবেই বিস্তর গান চলার পর রাবণের হাতে বেধড়ক লাঠিপেটা খেয়ে রণে ভঙ্গ দেয় সুগ্রীব। বিভীষণ তার আগেই পালিয়ে বেঁচেছেন। রাবণ আসছে শুনেই তেনার মনে পড়ে গিয়েছিল একটা 'গভীর জরুরি' কাজের কথা! তবে রামায়ণ-কে কলা দেখিয়ে এ নাটকের সবথেকে এককাঠি সরেস চরিত্র বীর হনুমান। রাবণ যখন ধাঁই করে লক্ষ্মণের বুকে শক্তিশেল মেরে দেয় হনুমান তখন ধারে-কাছে ছিল না। বসে-বসে বাতাসা খাচ্ছিল। তারপর যখন, 'পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (কেন) ঝড়ে কলা গাছ রে', তখন জাম্বুবান 'প্রেসক্রিপশন' লিখে দিয়েছেন বিশল্যকরণীর। কিন্তু হনুমান কিছুতেই পারে না। কখনও সে বলে রাতবিরেতে যেতে পারবে না, কখনও অজুহাত দেয় ডাক্তারখানা খুঁজে না পাওয়ার, অথবা পরামর্শ দেয় হোমিওপ্যাথি দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার! ভাগ্যিস সুকুমার রায়ের আমলে বামপন্থীদের দাপট ছিল না। নয়তো 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' লেখাই হয়ে উঠত না কোনওদিন। 'পলিটিক্যালি কারেক্ট' থাকার চাপ-ও এত অ্যাপ্লিকেবল হয়ে ওঠেনি তখন। ফলে বিভীষণ নির্দ্বিধায় সুগ্রীবকে বলে বসেন : 'দেখ, হাঁটিস দেখ—বাঁদুরে বুদ্ধি কিনা! ধ্যুৎ! যুদ্ধ করতে এসেছিস, এমনি করে হাঁটলে লোকে বাঙাল বলবে যে!'

বাঙালির দুর্ভাগ্য, সুকুমার রায়ের লেখা নাটক সেভাবে মঞ্চস্থ

হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে কেউ হয়তো কাজ করেছেন, কিন্তু দাগ কাটার মতো কিছু না। ফলে সুকুমারের নাটকের অন্তর্লীন যে ম্যাটারটা, সেটা একরকম অধরাই থেকে গিয়েছে। ধরা যাক 'ঝালাপালা'-র পণ্ডিতমশাই। সুকুমার রায়কে নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্রের সুবাদে এবং উৎপল দত্তমশাইয়ের তুখোড় অভিনয়ের গুণে সেই পণ্ডিতমশাইয়ের 'আই গো আপ, উই গো ডাউন'-এর বাংলা তর্জমা লোকের মুখে-মুখে ফিরেছে। যাঁর একমাত্র ধান্দা জমিদারবাবুকে কোনওমতে হাত করে জমিদারবাড়িতে একটা টোল খোলা, তো, সেই পণ্ডিতের জ্ঞানচিহ্ন ইংরেজি জ্ঞানের নমুনা 'ঝালাপালা'-য় আরও পাওয়া গিয়েছে।



কেষ্টা : পণ্ডিতমশাই, এই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না।

পণ্ডিত : হুঁ, দেখি নিয়ে আয়, কোন জায়গাটা। সব বলে দিতে হবে : ছেলেদের আর কিছু হবে না! 'ওয়ান্স্ আই মেট্ এ লেম ম্যান'—কিনা একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। 'ইন এ স্ট্রিট'—সে বিস্তর চেষ্টা করিল। 'নিয়ার মাই হাউস'—কিন্তু সে হাড় বাহির হইল না। এই সোজা ইংরেজী বুঝতে পারলি না?

(ঝালাপালা)

শুধু ইংরেজি নয়, পণ্ডিতের সংস্কৃত জ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, সবই সমান জবরদস্ত, গোটাটাই স্রেফ ওপরচালাকি। কিন্তু কেষ্টচাঁদ যখন দেশাত্মবোধক গান গায় এবং পুলিসের কাছে ওঠে 'সিডিশাস', তখন কিন্তু ইংরেজি শব্দটা নির্ভুল বুঝতে পারেন পণ্ডিত। আঁতকে উঠে বলেন, 'অ্যাঁ! কী বললে? রাজদ্রোহসূচক? অ্যাঁ?' যত মূর্খই হন না কেন, গা বাঁচিয়ে টিকে থাকার জন্য কাজের কথাগুলো সবই শিখে রেখেছেন 'ঝালাপালা'-র পণ্ডিত।

আসলে সিরিয়াসনেস-টা সবসময়ই ছিল সুকুমারের কলমে। নেহাত খেলো হাসির নাটক তিনি লিখে যাননি।

পিরিয়ড শেষ মানেই ফুরিয়ে যাওয়া নয়



ডাঃ পল্লব গঙ্গোপাধ্যায়

M.R.C.O.G (London)

কনসালট্যান্ট গাইনোকলজিস্ট

দূরভাষ । 9830931983

প্রতিটি মহিলার জীবনেই খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়েই আসে মেনোপজ বা ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া। মোটামুটি ৪৫ থেকে ৫২ এই বয়সটাই মেনোপজের সময়। ঠিক কবে এই স্বাভাবিক ঘটনাটি ঘটবে তা নির্ভর করে বেশ কিছু বিষয়ের উপর যেমন— জন্ম মুহূর্তে ওভারিতে ডিম্বাণুর সংখ্যা, অটোইমিউন ডিজিজের মতো বেশকিছু অসুখ ও তার চিকিৎসা এবং অবশ্যই বংশগতি। এই কারণেই মেনোপজ কখনও এগিয়ে আসে আবার কখনওবা পিছিয়ে যায়।

মেনোপজে সাধারণত যে উপসর্গগুলি সবাইকে বিচলিত করে তা হল হট ফ্লাশ, মাথাঘোরা, ঘাম হওয়া, নিয়মিত কাজকর্মে অবসাদজনক ভাবে ব্যাঘাত ঘটা। ইস্ট্রোজেনের অভাবে এই সময় ভ্যাজাইনার শুষ্কতা এবং ইনফেকশন (এ্যাট্রোফিক ভ্যাজাইনাইটিস) খুবই কমন ঘটনা। চিকিৎসার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যাদের ক্ষেত্রে হট ফ্লাশের মতো উপসর্গগুলি দৈনন্দিন জীবনধারাকে ব্যাহত করে, কাজকর্মে অনীহা নিয়ে আসে বা যাদের সময়ের আগে কমবয়সে (প্রি-ম্যাচিওর) মেনোপজ হয় তাদের ক্ষেত্রে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দেওয়া যেতে পারে।

যেহেতু ইস্ট্রোজেন হাড়ের মধ্যে ক্যালশিয়াম অনুপ্রবেশে সাহায্য করে, এসময় অস্টিওপোরোসিস, ফ্র্যাকচারও হতে পারে। ক্যালশিয়াম ও ফাইটোইস্ট্রোজেনযুক্ত সুষম খাদ্য যে কারণে জরুরী।

এছাড়া কারণে পেলভিক মাংসপেশি এবং বিভিন্ন লিগামেন্টে দুর্বলতা দেখা যায়। যেকারণে জরায়ু ও ভ্যাজাইনার নীচে নেমে আসা (প্রোল্যাপস Prolapse) এবং মূত্রবেগ ধরে রাখতে না পারা এই সময় খুবই কমন ঘটনা। অ্যাবডোমিনাল এবং পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই সময় অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে প্রোল্যাপস বা ইউরিনারি ইনকনটিনেন্স advanced stage-এ চলে যায় তাদের ক্ষেত্রে সার্জারি ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

মেনোপজের সময় আর এক বিপদ হল বয়সের কারণে শুরু হওয়া অন্যান্য সমস্যা। গাইনোকলজির ক্ষেত্রে সবথেকে বড় ভয় হল জরায়ু এবং ওভারির ক্যানসারের সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্যানসার এমনকি ফাইব্রোসিসও হতে পারে। এই কারণেই এসময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন Screening Test করানো উচিত (Pap smear Test, Lower abdominal ultrasonography, Mammogram)।

আবার পাশাপাশি যদি দেখেন বেশ কিছু সুবিধাও জুটে যায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই, যারা দীর্ঘ দিন ধরে অ্যানিমিয়ায় ভোগেন তাদের ক্ষেত্রে মেনোপজ আশীর্বাদের মতো। ব্লিডিং বন্ধ হওয়ার দরুন অ্যানিমিয়াও অনেকটাই উধাও হয়ে যায়। পাশাপাশি কন্ট্রাসেপশনের জন্য কোন রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এন্ডোমেট্রিওসিসের মতো ওভারিয়ান হরমোন সম্পর্কিত রোগ থেকে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা দেখা যায়।

কিন্তু যেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে মেনোপজ মানেই ফুরিয়ে যাওয়া নয়, বুদ্ধিবিবেচনা প্রভাবিত হওয়া নয়। সুতরাং মেনোপজকে Welcome করার জন্য আগে থেকেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন। দেখবেন এ যেন নতুন করে পাওয়া দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি।

তাতাবাবু

দেবদত্ত গুপ্ত

রামধনুকের আবছায়া

আশ্চর্য ইলাস্ট্রেটর সুকুমার। এমনকী অবন ঠাকুরের 'খাতাঞ্চির খাতা'-র সঙ্গে তিনি যে কেজো মানচিত্রটি আঁকেন, তাতে মুরগিহাটার আকৃতি মুরগির, পটলডাঙ্গার চেহারা পটলের, বৌবাজার যেন খোঁপা-বাঁধা বউ।



সুকুমার রায় মানেই, একবিন্দু মাথা না-ঘামিয়ে বলা যায়—'আবোল তাবোল', 'হাতিমি', 'পিরগিটিয়া'-সহ নানা উদ্ভট রসের বিস্তার ও গল্প। কিন্তু এই মজার মানুষটির আড়ালে ছবি-আঁকিয়ে সুকুমার রায়কে অনুসন্ধান করতে আমাদের বোধহয় অনেকখানি দেরি হয়ে গেল।

কটি মাত্র ইলাস্ট্রেশন দেখতে গিয়ে আমাদের লিয়র কিংবা ক্যারল-এর কথা বহুবার মনে পড়ে, কিন্তু তার পিকিউলিয়ারিটির অর্ধেক সময়ও মনে পড়ে না যে, সুকুমার ছিলেন একজন অসাধারণ কৌতুকচিত্রী, এবং তাঁর পিতা আর কেউ নন, স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোর। ১৮৮৭-র ৩০ অক্টোবর যে-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এই তালে, সেই পরিবারের কথাও একটু জানিয়ে নিতে হয়। উপেন্দ্রকিশোরের দাদা সারদারঞ্জন ছিলেন মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ। গণিতবিদ্যা, সংস্কৃত সাহিত্য, ক্রিকেট—তিনটি ক্ষেত্রেই দুরন্ত প্রতিভা ছিল তাঁর। ক্রিকেটে 'বাংলার ডব্লিউ জি গ্রেস' বলা হত তাঁকে; আরেকজন প্রমদারঞ্জন, তিনিও ছিলেন অঙ্কে এবং ক্রিকেটের প্রতিভাবান চরিত্র। (সেই সঙ্গে সরকারি জরিপ বিভাগেও কাজ করেছেন।) এই গণিত, জরিপ, ক্রিকেট এবং সর্বোপরি উপেন্দ্রকিশোরের ছাপাখানা ও হাফটোন-চর্চাকে বাদ দিয়ে সুকুমারের ছবিকে ধরা যায় না। গণিতের একটা মজার জায়গা জ্যামিতি। তাঁর ছবিতে, বিশেষ করে প্রচ্ছদপটের নকশায় ও অক্ষরমালায়, প্রচুর পরিমাণে জ্যামিতির কারুকাজের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অঙ্কে অনুপাত একটি বিশেষ বিষয়। সুকুমারের অসংখ্য ছবিতে, চরিত্রদের মূল মজাটা বের করে আনার জন্য তাদের শরীরের অনুপাতের ইচ্ছাকৃত ছোট-বড়, প্রায় বিসদৃশ ট্রিটমেন্ট, প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। আবার আমরা যখন ক্রিকেট-ব্যাট হাতে কুমড়ো নিয়ে পিসিকে ক্রিকেট খেলতে দেখি, তখন তাঁর পরিবারের ক্রিকেটচর্চা রসিকতার হাত ধরেই উঠে আসে।

সমকালীন লেখা ও ছবি আঁকার শিল্পীর জগতে সুকুমার ছিলেন এক অসামান্য 'দক্ষ' ব্যক্তি। তিনি যদি চাইতেন, এক দক্ষ ল্যান্ডস্কেপ-পেন্টার হিসেবেই হয়তো তাঁকে আমরা পেতাম। তাঁর জোলসত্যায় আঁকা 'সূর্যাস্তের গঙ্গা' ছবিটি অন্তত আমাদের সেদিকেই ইঙ্গিত করে। 'বানরী দল করিয়া রাবণকে ধরিয়াছে' ছবিতে, অথবা 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত হরিণের পিছনে সিংহের ধাওয়া করার ছবিটিও প্রমাণ করে, তিনি ইচ্ছে করলেই ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং-এ নিজের সিংহাসন পাকা করতে পারতেন। কিন্তু তা না-করে, তিনি অবতীর্ণ হলেন ইলাসট্রেটর-এর ভূমিকায়।

'আবোল তাবোল' কবিতার প্রথম ছবিটির দিকে তাকালে অবাক। আস্ত একটা সাইনবোর্ড। সেটি টাঙাতে ব্যস্ত চারজন মানুষ। 'আবোল তাবোল'-এর অক্ষরমালায় আমরা দেখতে পাই এরোপ্লেনের মতো টেক-অফ করার একটা তির্যক বিন্যাস। পুরো লেখাটা মাত্রা-ছাড়া। কোনও অক্ষরের কোনও মাত্রা নেই। মাত্রা নেই ব্যাপারটাই 'আবোল তাবোল'-এর ইনগ্রেডিয়েন্ট এনেছে। অক্ষরমালা সজ্জিত হচ্ছে অসংখ্য ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত বা অর্ধবৃত্তের টুকরো দিয়ে। 'আবোল তাবোল'-কেই মাথা তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে কয়েকজন, নিয়মের জড়তাকে ভেঙে দেওয়ার গল্পটা অনায়াসে তৈরি হয়ে যায় ছবির ভিতরেই।

'সন্দেশ'-এ ছাপা ছবি ও সেই সঙ্গে 'সন্দেশ'-এর বাইরে যা-যা ইলাস্ট্রেশন তিনি করেছেন, সবের মধ্যে অনায়াসে ধরা যায় তাঁর প্রাণের স্ফূর্তি এবং সাবলীলতা। ইলাস্ট্রেশন থেকে শুরু করে সর্বত্র—আমরা দেখতে পাই সেই বিরল বৈশিষ্ট্য—অবয়বের চরিত্র অনুসারে ছবিতে তা ফুটিয়ে তোলার গুণ। হেড অফিসের বড়বাবু একেবারেই এক চরিত্র। ছবির মধ্যে হাত তোলা ভঙ্গিতেই ধরা পড়ে লোকটির বদমেজাজি খ্যাপা গোছের স্বভাবটি। কাতুকুতু বুড়োকে দেখলেই তার গায়ের জোরে লোক হাসানোর প্রবণতা, পাগলা জগাইকে দেখলেই তার লড়াই-খ্যাপা স্বভাব, হুঁকোমুখো হ্যাংলাকে দেখলেই তার অতি বিশাল ও কাঁদো-কাঁদো অবস্থা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। রোদে রাঙা ইটের পাঁজার ওপর বসা রাজার উদ্ভট গোমড়া মুখটা দেখলেই আমাদের সন্দেহ থাকে না, তার হিসেব একেবারে কিচ্ছুটি মিলছে না। অবয়বের

চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় এরকম উপাদান ছাড়া বাড়তি কোনও কিছুকেই তিনি ছবিতে প্রশ্রয় দেন না। 'গোঁফ চুরি', 'ছায়াবাজি', 'খুড়োর কল' সর্বত্রই এই ব্যাপারটি স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা না-বললেই নয়, একই ব্যক্তি একইরকম বাহ্যিক চেহারায় শুধুমাত্র পোশাক পাল্টে-পাল্টে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে হাজির হয়েছেন সুকুমারের ছবিতে। 'আবোল তাবোল'-এর প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত ভীষ্মলোচনের ছবির অবয়বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় 'গোঁফ চুরি'-র বড়বাবুকে। উভয়ের গোঁফ, গলা, হাঁকার ভঙ্গির মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য। আবার এই বড়বাবুর সঙ্গেই আমরা 'খুড়োর কল'-এর খুড়োর অবয়বেরও সাযুজ্য খুঁজে পাই। তবে 'গোঁফ চুরি'-র বড়বাবুর পাতলুন 'খুড়োর কল'-এ কালো, এবং জামাটি সাদা। তফাত এটাই। এই মজার রস সুকুমারের ছবির ভিতর থেকেই তুলে নিতে হয়।

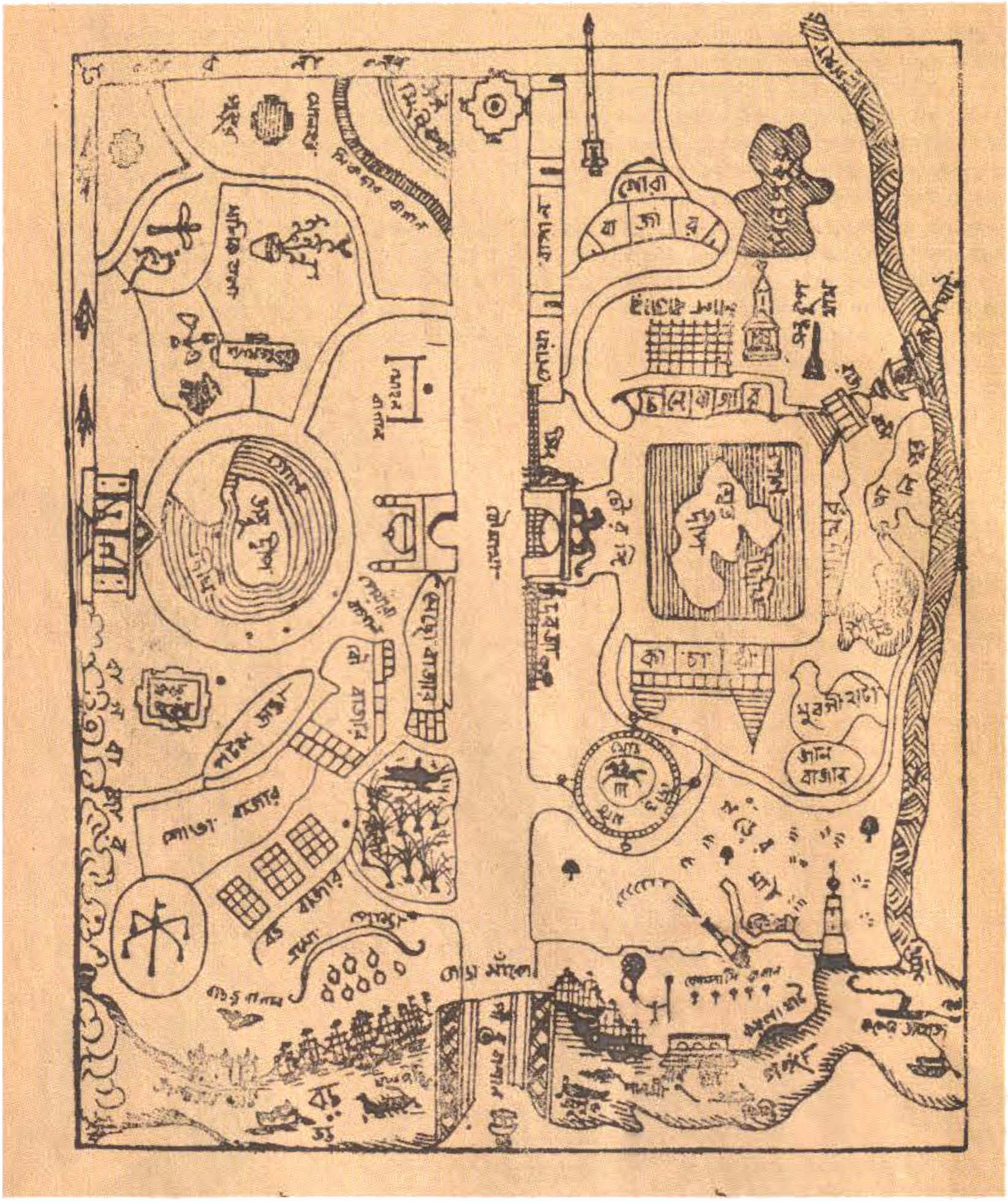
এবার আসা যাক সুকুমার রায়ের আরেক ধরনের ছবিতে। যে-





ছবিগুলো আমরা দেখতে পাই 'বুকমার ভূশ', 'ছবি ও গল্প' প্রভৃতিতে। 'ছবি ও গল্প'-তে সুকুমার রায় পরিষ্কার লিখছেন : 'ছবির টানে গল্প লিখি নেইক এতে ফাঁকি/ যেমন ধারা কথায় শুনি হুবহু তাই আঁকি।' এখানে পরীক্ষায় গোল্লা-পাওয়া দাড়িবুড়োর বাবু, তার ছানাবড়া চোখ দেখার সঙ্গে অবিকল ও আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে যায়। আবার, পাশের বাড়ির ছেলের আহ্লাদে আটখানা হওয়ার মধ্যেও পড়ে নেওয়া যায় শব্দের চাক্ষিক রূপ ছবিতে কীরকম ভাবে পরিবেশিত হচ্ছে, সেই ব্যাপারটিকে। এখানে ছবি যেন ছুট লাগিয়েছে অ্যাবসার্ডের দিকে। বিশেষ করে তা অসাধারণ মাত্রা পায় পিসির চোখের জলে সাঁতার কাটার অভাবনীয় দৃশ্যে।

আমরা যদি 'ট্যাঁশগরু', বা 'হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'-র হ্যাংলাথেরিয়াম, গোমড়াথেরিয়াম প্রভৃতি চরিত্রদের লক্ষ করি, দেখব, এদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে মানব-চরিত্রের হাবভাব। শিল্প-ঐতিহাসিক অধ্যাপক শোভন সোম এ-বিষয়ে লিখেছেন, 'এই রূপকল্পনায় আমরা তিনটি ব্যাপার লক্ষ করি। প্রথমটি হচ্ছে, আদিম অ্যানিমেল মোটিফের ব্যবহার। এই আদিমতা প্রতিটি প্রাচীন ধর্মসমাজে এখনও রয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পশু-রূপকের মধ্যে দিয়ে মানবচরিত্রের ইঙ্গিত, যা এদের বিচিত্র নামেও রয়েছে। আর তৃতীয়টি এই যে, এইসব হলেও হতে পারত জন্তুদের রূপ কল্পনায় তাঁর মনে হয়তো ফরাসি বিজ্ঞানী জর্জেস কুভিয়েরের ক্যাটাস্ট্রফি তত্ত্ব ছিল L..হফমান-র কাক, ছাগল, কুমির, বেড়ালের মধ্যেও তিনি মানুষের অ্যানিমেশন এনেছিলেন। শিল্পীর কল্পনায় প্রাণী মাত্রেই মানবিক দোষগুণ সম্পন্ন—এই কথা তাঁর মনে এইসব রূপকল্পনার কালে ছিল।' এখানে ভুললে চলবে না, রামধনুকের ছড়ার ছবিতে, আমরা তার পাশার আশেপাশে যে মেঘ আর গাছগুলো দেখতে পাই, খেয়াল করলেই দেখব, তাদের সবার মধ্যে মানুষের হাসিমুখের আদল। বোঝা যায়, আড়চোখে



'খাতাঞ্চির খাতা'-র ইলাস্ট্রেশন

মিটমিটিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে বেচারা কেমন দেখতে পায়, হাসতে-হাসতে সবাই সারা হচ্ছে, আর রামগরুড়ের কত ব্যথা লাগছে, কেউ বুঝতেই পারছে না। সেই সঙ্গে এটাও বলতে হবে যে, সুকুমারের বহু লেখায় ছবি এক চমৎকার পরিপূরকের কাজ করেছে। লেখার অক্ষরে যা লেখা নেই, তার অনেক কিছুই দেখা যায় ছবিতে। যেমন 'চোর ধরা' কবিতাটি। ছবিটা না-থাকলে কবিতাটি বোঝাই সম্ভব হবে না। 'হাতিমি' বা 'হাঁসজারু'-র ক্ষেত্রেও তাই। এই রূপকল্পনা সুকুমারের যুগে অবশ্যই অত্যাধুনিক।

পাশাপাশি, সুকুমারের অনেক লেখা ও অনেক ছবির মধ্যে আমরা দেখতে পাই তাঁর আত্ম-প্রতিফলন। যেখানে ছবি এমনভাবে গড়ে ওঠে, যা তাঁর আত্মরূপ বা প্রতিকৃতি বললে ভুল হয় না। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে 'আবোল তাবোল'-এর শেষ কবিতার ছবিটির কথা। এখানে ছবির মধ্যে সুকুমার কোনওভাবেই কবিতাটিকে বর্ণনা করেননি। এই ছবি তাঁর বর্ণনার অনুগত নয়। এখানেই আমরা খুঁজে পাই এক স্বতন্ত্র ছবি-আঁকিয়ে সুকুমার রায়কে, যিনি ইলাস্ট্রেটর নন। কালোর প্রেক্ষাপটে সাদায় ও কালির আঁচড়ে ফুটে-ওঠা এই ছবি চিনা চিত্রকলার মতো ওপর থেকে নীচে, খাড়াই পটে ও শূন্য প্রেক্ষাপটে নির্মিত। ছবিতে আমরা দেখতে পাই যে গোলটেবিল, তা আসলে ভূ-মণ্ডলের মতো। সেখানে রয়েছেন দাড়িওলা এক গণিত-বিশেষজ্ঞ। ইনি হলেন বিজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী। মাথায় চশমা তুলে স্কেল-কম্পাস নিয়ে ইনি তাকিয়ে আছেন যাঁর দিকে, তিনি এক নবীন বাঁশিওলা। ভেসে চলেছেন বাঁশি হাতে মেঘের ভেলায় চেপে। এই ছবির ছক

দেখে অনেকে পাশ্চাত্যের স্যুররিয়ালিজম-এর কথা বলবেন ঠিকই, কিন্তু এই ধরন তো আমাদের প্রাচ্যের। অজন্তা-র প্রাচীর-চিত্রে মেঘের গায়ে বাদ্যযন্ত্র হাতে ভাসমান গন্ধর্বদের কথা মনে করা যেতেই পারে।

পাশাপাশি অবশ্যই বলতে হবে ছবির চরিত্র দু'টির কথা। একজন চিরনবীন বাঁশি-বাজিয়ে বালক, আরেকজন বৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ। একজন তত্ত্বজ্ঞানী ও আরেকজন শিশুর মতো খেয়ালি। এক তত্ত্বজ্ঞানী যেন নিজেই নিজের শৈশবের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। সুকুমার রায় নিজেও ছিলেন বিজ্ঞান ও অংকের তত্ত্বজ্ঞানী, আবার একইসঙ্গে তাঁর মন ছিল মেঘমুলুকে বাঁশি হাতে ঘুরে বেড়ানো এক কল্পনাপ্রবণ বালক শিশুর মতো। এই দুইরকম প্রবণতার সংমিশ্রণেই যে সুকুমার, ছবিতে সেই চরিত্র বা আত্মনামটি স্পষ্ট পড়ে নেওয়া যায়। বাবা-কাকাদের গণিতচর্চার ধারা পেয়েছিলেন সুকুমার। আর সে-সূত্রেই হয়তো এই ছবির গণিতজ্ঞ-সহ অনেক ছবির চরিত্রদের আমরা অনায়াসে খুঁজে নিতে পারি উপেন্দ্রকিশোর, সারদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন, শিবনাথ শাস্ত্রীর অবয়বের আড়ালে, যাঁরা লুকিয়ে আছেন পারিবারিক অ্যালবামের পাতায়-পাতায়।

আবার এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে পড়তে পারে মাঘ ১৩২১ বঙ্গাব্দের 'সন্দেশ'-এ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'খুকুর লেখা' কবিতার যে-বাচ্চাটির ছবি সুকুমার এঁকেছিলেন, তার কম্পোজিশনের কথা। ছবি দেখতে-দেখতে যখন লক্ষ করা যায় সূক্ষ্ম রেখা, বর্ণপর্দায় সাদা-কালোর বিন্যাস, যা অনেকটা হাফটোনের মতো, তখন বোঝা যায় ফোটোগ্রাফের চরিত্র কীভাবে ছায়াপাত করেছে। সুকুমার তাঁর ছবিতে ফোটোগ্রাফির সিল্যুয়েট-এর ধারাকে এনেছিলেন চমৎকার ভাবে। ১৯১৫-র ডিসেম্বরে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' সম্পাদনার দায়িত্ব নেন তিনি। সেবারের 'সন্দেশ'-এর প্রচ্ছদে, নীচের প্যানেলে ও সেই বইতে প্রকাশিত 'দাদে কি বলে শাবা' ছবিতে, আলোকচিত্রের মতো সিল্যুয়েট-এর ব্যবহার দেখি।

এবার একটা অন্যরকম ছবির প্রসঙ্গ। সেটা বাংলা ১৩২৭



শিল্পী পল গগ্যাঁ একবার 'ইয়েলো ক্রাইস্ট'-এর যে-ছবি এঁকেছিলেন, সেখানে যিশুর গায়ের হলুদে রংটি যিশুর মৃত শরীরের জীর্ণতাকে রঙের ভাষায় প্রকাশ করে। আসলে ছবিতে রং একটা ভাষা হিসেবে কাজ করে। সুকুমারের একটি ল্যান্ডস্কেপ, আগেই এর কথা উল্লেখ করেছি—'সূর্যাস্তের গঙ্গা'। ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল কার্তিক ১৩৩০ বঙ্গাব্দের 'সন্দেশ'-এ। এই ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন সোদপুরে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে। ছবির বিষয়টি খুব অভিনব না-হলেও, তার উপস্থাপনা যথারীতি আমাদের আশ্চর্য করে দেয়। এই ছবির সঙ্গে আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি আরও অনেক কিছুকে। সুকুমার তখন তরুণ, বয়স ছত্রিশ বছর। এই অল্প বয়সেই কালাজ্বরের রোগ তাঁর জীবনের

'সূর্যাস্তের গঙ্গা' ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল কার্তিক ১৩৩০ বঙ্গাব্দের 'সন্দেশ'-এ। এই ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন সোদপুরে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে। ছবির বিষয়টি খুব অভিনব না-হলেও, তার উপস্থাপনা যথারীতি আমাদের আশ্চর্য করে দেয়।

বঙ্গাব্দ। 'সন্দেশ'-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খাতাঞ্চির খাতা'। সেখানে ইলাস্ট্রেশন করছেন সুকুমার। সেই ছবিগুলির মধ্যে আমরা আপাতত খতিয়ে দেখি একটি মানচিত্রের ছবি। মানচিত্রটি ভারী অদ্ভুত প্রকৃতির। মুরসিদাবাদের আকৃতি ঠিক মুরগির মতো। আর মুরগির ডান, যা থাকে ডিমের ভিতরে, সেই ডিমের আকৃতিতে দেখা যায় জালনাজার এলাকাকে। পটলডাঙার চেহারা পটলের মতো, বৌবাজারের চেহারা মাথায় ঘোমটা-বাঁধা বউয়ের মাফিক। এইভাবেই ক্রমশ উদ্ঘাটিত হয়—বেলেপুকুরের ছক যেন মাটির বেলেপুতুলের মতো, পাতিপুকুরের আকৃতি পাতিহাঁসের মতো। আর বাগবাজারের গায়ে রেখায় দাপটে যে-বাঘ এঁকেছেন, সেখান থেকে বেরিয়ে আসে 'চিতাবাঘ' লেখা প্রথম অংশটি। আসলে বাগবাজারের 'বাগ'-এর সঙ্গে বাঘের কোনও একটা শব্দমিল খুঁজে নিয়েছিলেন সুকুমার। এই ইলাস্ট্রেশন এককথায় অনবদ্য। কারণ, এর মধ্যে সুকুমার জুড়ে দিয়েছিলেন নিজস্ব রসবোধের অনবদ্য পরিচয়।

ছবির ভাষায় থাকে স্বাধীনতা। ছবির রচনে অনেক সময়েই তৈরি হয় কিছু সমান্তরাল গল্প বা আত্মজীবনের টুকরো। ছবি তৈরির এই স্বাধীনতাই শিল্পীকে নিজস্বতা দান করে। পাশ্চাত্যের

শেষ সময়কে হাজির করেছে। কিন্তু মৃত্যুশয্যাতেও তারুণ্যে ভরপুর যুবক হয়ে তিনি জলে উঠতে চান স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্যছটার মতো।—এ নিহিত আখ্যানই ছবিটিতে আঁকা হয়েছে। সাধারণ ভাবে সূর্যাস্তের ছবি বললেই আমাদের মনে পড়ে আকাশের রং হবে হলুদ, লাল বা কমলা। অথচ এখানে সূর্যাস্তের রং তারুণ্যের সবুজ বর্ণপর্দায় ('ট্রেন') মাখা! আর সেই তেজ ছবির উজ্জ্বল সূর্যরশ্মিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান। তাঁর ছবির বিষাদ একাধারে হতে চায় এক রোগজীর্ণ তরুণের জীবনসায়াহ্নের সঙ্গে। আর ছবিতে পাল-তোলা নৌকো যেন সেই অব্যক্ত বাণী, যা বলে 'তুমি এপার ওপার করো কে গো, ওগো খেয়ার নেয়ে'।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এই ছবির পাশে-পাশেই তো তিনি লিখেছিলেন, 'দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ'। দস্যি ছেলের রং আবার ছবিতে হয়ে যায় সবুজ, আর তাঁর লক্ষ্মী হয়ে গুটিয়ে যাওয়ার বেদনাই যেন হয়ে উঠেছে ছবির সূর্যাস্ত-বিষাদ—

'আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।'

সুধীর চক্রবর্তী

বড়পুজো আর কালীপুজোয় শত শত ঢাক বাজে। সেই ঢাকের বাহার করাতে পাখির পালকের সজ্জা লাগে। সবই বকের পালক। বক মারে ঢাকিরা। পুজোর আনন্দ আর বকেদের মরণ।



এবার আষাঢ়ে তেমন বৃষ্টি হয়নি, অন্তত আমাদের এইদিকে। যত বর্ষণ যেন জমানো ছিল ভাদ্র-আশ্বিনের জন্যে। তাই শরতের অমল মহিমা প্রায় অদেখাই থেকে গেল। সবাই বলতে লাগল, এবার পুজো বৃষ্টিতে ভেসে যাবে। এমন আশঙ্কা মানুষের কেন যে জাগে, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারি, মানুষ উৎসবকে ভালবাসে। এখন দেখতে পাই ঈদ আর মহাপুজোর অসময় সংযোগে দু'টি ভীতি মানুষকে অতিশয় কাতর করে। বর্ষার জলভরা মেঘে যদি ঈদের চাঁদটাই দেখা না যায়, অথবা অতিবর্ষণে ঈদের নামাজ আদায় করতে যদি শত শত মানুষ মাঠে কাতার দিতে না পারে! তার চেয়েও বড় ভয় হল, দুর্গাপূজা প্যান্ডেল-সজ্জাকে বর্ষা যদি তছনছ করে দেয়। কিংবা, এতদিনের এত আয়োজন, এত উৎসাহ-উদ্দীপনা, এত সাজগোজ মাটি করে দেবে না তো বর্ষার নাকে-কান্না নাছোড় বৃষ্টি? আর আমাদের শুধু তো আনন্দময়ীর আরাধনা নয়, তার পিছনেই লাইন দিয়ে আসবে সবচেয়ে জনপ্রিয় শ্যামা মায়ের দীপোজ্জ্বল সমারোহ, তারপরে জগদ্ধাত্রী পুজো, রাসযাত্রা—যার শেষ হবে সেই কার্তিকপুজোয়। এর মধ্যে কালীর আরাধনা সবচেয়ে সর্বজনীন। এমন কোনও বর্ধিষ্ণু জনপদ নেই, যেখানে শক্তিপূজায় কোনও আলস্য আছে। তিন ফুট থেকে তিরিশ ফুট কালীমূর্তি—ঘর থেকে প্যান্ডেলে হবেই হবে। জগদ্ধাত্রী, রাস আর কার্তিকপুজো অনেকটাই অবশ্য অঞ্চলভিত্তিক। যেমন জগদ্ধাত্রীপুজোর জাঁক আর বিচিত্র নির্মাণের প্রতিমা দেখতে যেতে হবে কৃষ্ণনগর, চন্দননগর আর সূত্রাগড়ে। যাওয়া যেতে পারে মুর্শিদাবাদের সালারের কাছে কাগ্রামে। রাসপূর্ণিমার রকমারি শক্তিমূর্তি দেখতে যেতে হবে নবদ্বীপ আর শান্তিপুরে—সেইসঙ্গে কৃষ্ণমূর্তিরও ঘটে নানা উদ্ভাস, ফলে তা সম্ভ্রান্ত ও লৌকিক বৈভব পরিবারকে কেন্দ্র করে। কার্তিকপুজো মানেই কাটোয়া আর দাঁইহাট বর্ধমান জেলায়, হুগলি জেলার চুঁচুড়া আর বাঁশবেড়িয়ায়, বাঁকুড়ায় সোনামুখীতে—একেবারে স্পন্দমান জনসংস্কৃতির অপরিহার্য নিদর্শন। এসবই আমার বহুবার চোখে দেখা আর সম্পৃক্ত হওয়া।

কিন্তু লেখা শুরু করেছিলাম এবারকার খটখটে শুকনো আষাঢ় মাসের প্রসঙ্গ তুলে। এক হুজুগে যুবকের খুব ইচ্ছে যে পদ্মমালার বিলে গিয়ে নৌকো চেপে বন্দুক দিয়ে পাখি শিকার করবে। তার সঙ্গী হতে হবে। পক্ষীনিধনে এবং হত্যাজাত মাংস ভক্ষণে আমার কিছুমাত্র উৎসাহ নেই, কিন্তু সেটা একটা স্পোর্ট বটে—খুব দর্শনীয়—ছোটবেলা থেকে দেখছি। তাই যুবকের ইচ্ছের সঙ্গে আমার স্মৃতিকাতরতা এসে মিলল। একটা সময় সত্যিই ছিল, যখন বাবুদের বন্দুকের নেশা আর পাখি শিকারের শৌক ছিল, এখন নাকি অনেক সব নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। হবেও বা। তবে এখন কেউ বন্দুক বললেই বন্দুকবাজ কথাটা এসে পড়ে—'শোলে' ছবিটার স্মৃতি জাগে—এখন আবার হার্মাদ বলে একটা শব্দ যোজিত হয়েছে আমাদের শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায়। সে যাই হোক, আমার বেশ মনে পড়ে, ঘোর ব্রিটিশ আমলে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি আমাদের শান্ত, নিস্পন্দ গ্রামের বাড়ির পাশের কামারশালায় বসে শুনতাম ন্যাড়া কামারের শিকারের গল্প, চোখ বড় বড় করে। আমরা বলতাম, ন্যাড়াদা। তার এক-একদিন শখ চাপত পাখি শিকারের। তখন মালকোঁচা মারা ধুতির ওপরে চড়িয়ে নিত একটা খাকি হাফ-শার্ট—সেটাই নাকি শিকারের ড্রেস, ব্রিটিশ সাহেবরা পরে, তাতে দু'টো বুকপকেট।

আমাদের মতো শহরবাসী অবোধ কিশোরদের ন্যাড়াদা অনেক জ্ঞান দিত। যেমন ওই খাকি হাফ-শার্ট আর তার বুকে দু'পকেট থাকার রহস্য। স্যামুয়েল নামের এক দুরন্ত পুলিশ অফিসার নাকি আসতেন চিতাবাঘ শিকারে। তাঁর থাকত দু'পকেটে ডায়েরি আর ঘড়ি। 'ডায়েরিতে কীসব নোট করত সাহেব আর বাঘকে ফায়ার করেই ঘড়ি দেখত। কেন কে জানে! তবে স্যামুয়েল সাহেবকে দেখেই বুঝলাম—ভাল শিকারি হতে গেলে ওই খাকি হাফ-শার্ট চাই-ই চাই, তো শান্তিপুরে গিয়ে করিয়ে আনলাম, বুঝলে?'

—তা আজকে ওটা পরলে কেন?

—বন্দুকটা ব্যবহার না করলে মরচে ধরে যাবে, তাই ভাবলাম এই শেষ-দুপুরে মিত্তির বাগে তোমাকে নিয়ে যাব।

—বাঘ মারবে না কি?

—দুৎ, এখন বাঘ কোথায়? সব সাহেবরা লোপাট করে দিয়েছে। জঙ্গলে এখন শুধু বনবেড়াল, উদ্‌বিড়াল, খ্যাঁকশিয়াল আর ভাম। ওসব মেরে সুখ নেই। আমি যাব হরিয়াল শিকারে। বটগাছের সবুজ পাতার সঙ্গে মিশে থাকে। সবুজ পাখি তো! তবে খেতে খুব সুস্বাদু।

তা এতদিন পরে চেনা যুবকটি যখন এসে বলল পদ্মমালার বিলে শিকারে যাবে, তখন মনে

পড়ে গেল ন্যাড়ানর সঙ্গে হরিয়াল শিকারের স্মৃতি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, উঃ কতকাল যে বিলে-বাওড়ে ঘুরিনি নৌকো চড়ে। পাখি শিকার আসলে একটা উপলক্ষ, আমি চাইছিলাম জলের সঙ্গ—বিশেষ করে এবারের আষাঢ় যে বড়ই শুখা।

কিন্তু পঞ্চমালার বিলে আগেকার মতো এখন তত জল নেই দেখে মনটা দমে গেল। পাখপাখালিও যে খুব সুলভ, তা মনে হল না। মাঝি বললে, 'জমিতে এত বিষ দিচ্ছে যে জমিতে পাখি বসে ফলপাকুড় ঠুকরে খাচ্ছে আর মরে যাচ্ছে। তবে আকাশচরা পাখি এখনও দেখা যায়, তবে কী জানেন, মানুষ বড় নিষ্ঠুর। ধরুন, এই যে সামনে আসবে দুর্গাপুজো আর কালীপুজো, তাতে শত শত ঢাক বাজবে। সেই ঢাকের বাহার করাতে পাখির পালকের সজ্জা লাগে। কীসের পালক জানেন? সব হল বকের পালক—সাদা আর রবোঝারি। কত যে বক মারবে ঢাকিরা, শুনতে পারবেন না।'

—কী করে অত বক ধরে? সামনে গেলেই তো উড়ে যাবে!

—কেন? জলাজমিতে, যেখানে দলে দলে বক এসে বসে—যাকে বলে বক-চরার মাঠ, সেখানে কলিজল স্প্রে করে দেবে, সঙ্গে প্রচণ্ড বিষ এনড্রিন। জায়গায় খাবে জায়গায় মরবে। ব্যস, তারপরে কেটে নাও পালক। কী বুঝলেন বাবু? মানুষের পুজোর আনন্দ আর বকেদের মরণ।

এত কথা কি আমরা জানি, না ভাবি? পথে-বিপথে ঘুরে এসব





হঠাৎ জানা যায়। যা হোক সেদিন পদ্মমালায় একটা-দু'টো কামপাখি মেরে আমরা যখন ফিরছি, তখন দেখি বিলের পাড়ে একখানা ভ্যান-রিকশায় বসে আছে আমাদের শহরের তারাপদ মালাকার। তাকে জিগ্যেস করি, 'কী ব্যাপার তারাপদ? তুমি এখানে বসে যে।'

তারাপদ-র জাতব্যবসা হল দেবীমূর্তির শোলার সাজ বানানো। সলমা, চুমকি লাগানো জাঁকালো মুকুট আর গলার হার, হাতের সজ্জা। তার বাড়ি হল আমাদের নাগদিপাড়ায়। তার বাবা মন্মথ মালাকার চমৎকার মুকুট বানাত আর আমরা স্কুল পালিয়ে সেসব দেখতাম সামনে বসে মুগ্ধ চোখে। শোলা কেটে নানান ডিজাইন বানিয়ে তাতে নানা রঙের রাংতা দিয়ে কী যে চোখ-ধাঁধানো গহনা বানাত মন্মথজেঠু, আর সঙ্গে মুখ চলত। একদিন বলল, 'খোকারা এ আর কী দেখছ? এসব কাজ দেখতে হত আমার বাপের আমলে। তাকে বলত ডাকের সাজ, কথাটা শুনেছ?'

—হ্যাঁ। আগেকার বনেদি বাড়ির প্রতিমাকে সাজানো হত ডাকের সাজে। একথা বাবার মুখে শুনেছি। সেটা কী জিনিস জ্যাঠা?

—সেকালে ঝকমকে সাজ আর রাংতা, সলমা, চুমকি—এসব তো এদেশে পাওয়া যেত না, আসত ডাকযোগে বিদেশ থেকে। তাই বলত ডাকের সাজ। বুঝেছ?

এসব শিল্পঘটিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান সরেজমিনে আমার জানা হয়েছিল বেশ অল্প বয়সে। তো সেই মন্মথজ্যাঠার ছেলে হল তারাপদ মালাকার—বসে আছে ভ্যান-রিকশায়। সে এককালে আমাদের স্কুলেই পড়ত—পড়া এগোয়নি খানিকটা দারিদ্র্যে, খানিকটা অবহেলায়। এখন সে পাকাপাকি শোলার সাজের শিল্পী। কিন্তু এখানে এই পদ্মমালার বিলে সে কেন? আমরা তো এসেছি শিকারের টানে মোটর সাইকেল চেপে, সে বোধ হয় টানা ভ্যান-রিকশা চেপে এসেছে। ঠিক তাই। বলল, 'এই বিলে খুব ভাল শোলা পাওয়া যায়। দেখছ না জলের তলার দিকে শ্যাওলা আর দামের মধ্যে কালো মতন লম্বা লম্বা?'

—হ্যাঁ, চোখে পড়েছে তো। ওগুলোই বুঝি শোলা?

—ওগুলোই শোলা—একরকম জলজ ফসল। পাঁজা করে কেটে তুলে নিয়ে ভ্যানে করে সোজা বাড়ি যাব। এখানে যে বিল জমা নিয়েছে, তাকে টাকা দিতে হবে যৎসামান্য। তারপরে রোদে শুকিয়ে একরকম অস্ত্র দিয়ে চেঁচে, ওপরের কালো ছালটা তুললেই সাদা শোলা বেরিয়ে পড়বে। তাকে সাইজ করে কেটে ফালা করে চিরে শোলার ফুল, মালা, গয়না এসব হবে আস্তে আস্তে—সে তো তুমি আমাদের কারখানায় ছোটবেলা থেকেই দেখেছ, তাই না?

—তা দেখেছি তো বটেই, কিন্তু সেই শোলা যে গাঁয়ের বিল থেকে এভাবে নিয়ে যেতে হয়, সেটা এতদিনে জানলাম, দেখলাম স্বচক্ষে। বাঃ বেশ মজা লাগছে। তো, এখন এই আষাঢ়ে নিয়ে যাচ্ছ, কাজ হতে অনেক যে দেরি—বড়ো সেই আশ্বিন- কার্তিক মাসে। এত আগে এসেছ কেন?

এবারে তারাপদ হেসে ফেলে বলল, 'তোমাদের কোনও ধারণাই নেই যে পুজো আসার কত আগে থেকে আমাদের হাতের কাজ শুরু হয়ে যায়। এ যে সূক্ষ্ম হাতের কাজ, মেশিনের কোনও ব্যাপারই নেই—সময় লাগে। সারা বর্ষাকাল—বারো শ্রাবণ আর ভাদর, বাড়ি থেকে বেরবার উপায় নেই, এত বৃষ্টি! কিন্তু দেখবে মালাকরদের কারখানায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ চলছে। এখন তবু তাও ইলেকট্রিক আলো হয়েছে। বাবা-মা-দিদিরা তো হ্যারিকেনের সামান্য আলোয় কাজ করত আর দমাদমিয়ে যাবত।

—মা আর দিদিরা মানে?

—এ কী? তুমি জানো না? দুপুরবেলায় বাড়ির রান্নাবান্নার কাজ সেরে বাড়ির মেয়েরা বরাবরই আমাদের কাজে হাত লাগায়—নইলে পোষাবে কী করে? বাইরের মিস্ত্রি নিলে যে মজুরি লাগবে, আর তা দিতে হবে দৈনিক নগদানগদি, বুঝেছ? কতটা টাকা বাঁচানো যায়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। পুজোর তিনমাস আগে কুমোরবাড়ি গেলে দেখবে, ভেতরের দাওয়ায় বসে বউরা হয়তো ঠাকুরের মাটির গহনা ছাঁচে ফেলে বানিয়ে রোদে শুকোচ্ছে। নদীর ধারে যে পালপাড়া আছে, সেখানে ভাদ্র মাসে গেলে দেখবে বউরা—এমনকী মায়েরা খবরের কাগজ কেটে তাতে খড়ি লাগিয়ে, তার সাদা জমিনে নানা রঙের চালচিত্র আঁকছে—শিবের বাড়ি কৈলাস, গঙ্গোজননী, রক্তবীজ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু— কত সব ছবি লিখছে। পরে দেবীচালে সেগুলো সেঁটে দেবে।

লক্ষ করে দেখলাম, তারাপদ খুব কথা বলতে ভালবাসে। আসলে সারা বছর তাকে মুখ বুজে কাজ করে যেতে হয়। তাই আমাকে পেয়ে একেবারে বাক্যের স্রোত ছুটিয়ে দিচ্ছে। তা হোক, আমার ভালই লাগছে, জানাও হচ্ছে কত কিছু তাকে তাই উস্কিয়ে দিয়ে বলি, 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে, কুমোরদের উঠোনে রোদে শুকোচ্ছে খড়ি-মাখা ঠাকুর—তাতে আসল যেটা রং, অর্থাৎ মা দুর্গার হলদে, গণেশের লাল, অসুরের সবুজ—এসব মেয়েরাই লাগাচ্ছে—পরে চোখ এঁকে চামটেল দিয়ে ঝিলিমিলি টাচ দেবেন বাড়ির কর্তা পালমশাই।'

তারাপদ বলে, 'বুঝলে, একবার এখানকার দর্জি রহমন শেখের সঙ্গে গেছিলাম—সেই যাকে বলে মেটেবুরুজ। কলকাতা থেকে কতদূর। সামনে সেবার ঈদ আর তার গায়ে গায়ে পড়েছে আমাদের বড় পরব। তো, কী বলব ভাই, মেটেবুরুজে ঘরে ঘরে চলছে সেলাই মেশিন। পাইকিরি রেটে রেডিমেড পোশাকের আড়ত। ওস্তাগরদের কাজ চলছে সামনে, আর ভেতরবাগে বাড়ির বউরা করে যাচ্ছে হেমসেলাই, বোতামঘর, চুমকি বসানো আর বাহারে নকশা বসানোর কাজ। তাই তো হতে হবে। নইলে একা হাতে কি অত কাজ তোলা সম্ভব? অথচ দামি অর্ডার ফেরানো যাবে না, তা হলে পার্টি চলে যাবে অন্যদের মতো অন্য কারিগরের ঘরে। মোট কথা, পার্টি আটকে রাখতে হবে ছলেবলেকৌশলে দিয়ে।'

—শোলার কাজে ডিম্যান্ড কেমন?

—এদিকে তত নয়, কিন্তু আমাদের অর্ডার আসে বর্ধমান সাইড থেকে। জানো তো বর্ধমান লাইনে বনকাপাসী প্রায় একেবারে সেরা কারিগরদের আস্তানা। অনন্ত মালাকারের নাম শুনেছ তো? রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়া শিল্পী। কী সূক্ষ্ম হাতের কাজ। চন্দননগরের অন্তত বাট-সত্তরখানা মস্ত বড় বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমার

বিরাট মাপের শোলার সাজ আর মূর্তির পিছনের ছটার কলকার কাজ একেবারে বাঁধা অর্ডার বনকাপাসীর। সারা বছরের প্রধান উপার্জন আমাদের এই বড়পুজো। আষাঢ় থেকে তার শুরু, এই যে তার শোলা চলল ভ্যানগাড়িতে। বুঝলে?

এতদিন জানতাম না এতসব বৃত্তান্ত, তাই বুঝতাম না কারিগরদের লড়াইয়ের খবর কিংবা এত দীর্ঘ প্রস্তুতির ব্যাপার-স্যাপার। দুর্গাপুজো কিংবা কালীপুজো আমাদের কাছে এক মস্ত বিনোদন। সাজগোজ, খাওয়াদাওয়া, আত্মীয়-সমাগম, নতুন জামা-জুতো, প্রচুর ঠাকুর দেখা প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে। আর তরুণ-তরুণীদের মেলামেশার অবাধ চর্চা—যৌবনের রহস্যময় শরীরী ভাষা। মনের এত ঔদার্য এসে যায় যে কেউ কেউ পথের ভিখিরিকে পরিয়ে দেয় নববস্ত্র। সেবার দীপাবলি উৎসবে দেখলাম আমাদের পট্টির পাগলি মেয়েটা একটা নতুন কাফ্‌তান পরে হেসেই আকুল। কিন্তু উলটো খবরও তো আসে। যেমন ধরা যাক, বাসে চেপে যাচ্ছি বোলপুরে মহাষষ্ঠীর ভোরে। নিরোল গ্রামটা ছাড়াতেই কোমরপুর হাট—কী ভিড় কী ভিড়। মানুষের যেন ঢল নেমেছে, বাস দাঁড়িয়ে গেছে। তড়িঘড়ি নেমে খোঁজ করি—চোখে পড়ে একটা চালিতে বাঁধা যুবকের মৃতদেহ। একজন বললে, 'টাকা দিন।' বুঝলাম গরিব মানুষের সৎকারের টাকা নেই, তাই চাঁদা। পকেটে হাত দিয়ে টাকা বার করতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে হল, বললাম, 'এত কাঁচা বয়সে এ মরণ কীভাবে?'

একজন গেঁজেল বিকট হেসে বলল, 'মা দুগ্গার ভোগে চলে গেল বুইলেন?' তাই শুনে একজন বয়স্ক মানুষ তাকে ধমকে বললেন, 'তুই থাম তো হাবুল। আসলে স্যর, ওর, মানে এখন যার ডেডবডি দেখছেন, ওর নাম সহদেব কয়াল, অপঘাতে মরে গেল মহাষষ্ঠীর ভোরে।'

—কেন? কীভাবে?

—আসলে বেকার। বাড়িতে রোজই গঞ্জনা শোনে। এদিকে প্রেম করে বিয়ে করেছে। তো এখানে অনেকগুলো দিঘি আছে, যাকে বলে পদ্মদিঘি। মানে বোঝেন? অর্থাৎ কিনা যে দিঘিতে প্রচুর পদ্মফুল ফুটে থাকে। কাল সপ্তমীপুজো, তাতে অনেক পদ্ম লাগে। ক'টা পদ্ম বলুন তো?

—রামচন্দ্রের তো লেগেছিল ১০৮টা—তা সে তো গল্পকথা। সত্যি সত্যি কি আর ১০৮টা পদ্মফুল জোগাড় করা সম্ভব?

—না, সম্ভব হয়তো, তবে কঠিন। তবু পুজো পিছু আট-দশটা তো লাগবেই। সেই ভেবে একটা ঝুড়ি নিয়ে খুব ভোরে সহদেব এসেছিল পদ্মদিঘিতে। বোধহয় ভেবেছিল যতগুলো পারে পদ্মফুল তুলে চলে যাবে কাটোয়া বাজারে। কাটোয়ায় প্রচুর ধনী লোক থাকে। বেশ ভাল দামে তার এত কষ্ট করা ফুল বেচে বাড়িতে বড় করে মাছ-টাছ কিনে নিয়ে চমকে দেবে বচ্ছরকার দিনে। কিন্তু বিধি বাম।

—কেন কী হল?

—সাঁতরে পদ্মদিঘি থেকে গোটা কয়েক পদ্ম তুলে এনে ঝুড়িতে রেখে আবার সাঁতরে যাচ্ছে। ইত্যবসরে তার তো জানা ছিল না যে পদ্মের ডাঁটা জড়িয়ে থাকে বিষধর সাপ! এবারে যেই একটা পদ্ম ছিঁড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মরণ-ছোবল। পড়িমরি করে কোনওরকমে এপারে এসেই—বাস অজ্ঞান। কতক্ষণ ওইভাবে পড়েছিল, কেউ তা জানে না। পাড়ার বউ-ঝি'রা মাঠ সারতে গিয়ে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, লোকজন ছুটে এসে হেল্‌থ সেন্টারে নিয়ে যায়—ততক্ষণে শেষ।

আমি একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়ি। রামচন্দ্রের ১০৮ পদ্মের মিথ আর তার আদলে তৈরি পূজাবিধি একজনের মৃত্যুর কারণ হয়ে গেল? আমি কোনওরকমে বললাম, 'সৎকারের খরচের জন্যে চাঁদা তুলছেন? কত দেব বলুন তো?'

—সৎকারের খরচ তো আমরাই সামলে দিতে পারি। আমরা চাঁদা তুলছি সহদেবের কচি বউটার জন্যে। এক বছরও বিয়ে হয়নি. বেধবা হয়ে গেল। দিন আপনার যা মনে চায়।

সঙ্গে তেমন টাকা ছিল না। আমি মৃতদেহের শিয়রে একটা পাঁচশো টাকার নোট রেখে বাসে উঠে মুখ লুকোই।

এইরকম এক মর্মান্তিক অপঘাতের দৃশ্যগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি সেদিন এক লহমায় বুঝে ফেলি আমাদের ঢক্কানিনাদিত প্যান্ডেল-শোভিত নানা সব শারদ উৎসবের অন্তরালে রয়ে যায় কত বেদনার আয়োজন। এসব খবর কোনওদিন রাজনীতি আর প্রশাসনভিত্তিক বা বাণিজ্যময় খবরের কাগজে সামান্যতম স্থান করে নিতে পারে কি?

এর পাশে মনে হল, আমরা জানি না মুর্শিদাবাদে সালারের পাশের গ্রামের সর্বেশ্বর দাসাধিকারী আর মকবুল হোসেনের প্রস্তুতির কথা। তাঁদের সঙ্গে নিতান্ত ঘটনাচক্রে আলাপ হয়েছিল বীরভূমের কোটাসুরে এক কালীপুজোয়। ওঁরা এসেছিলেন সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে কবিগানের আসরে। সাঙ্গপাঙ্গ মানে একজন সানাইবাদক আর এক ঢুলি। সর্বেশ্বর আর মকবুলের কবিগান ছিল বিখ্যাত। কালীপুজো থেকে জগদ্ধাত্রীপুজো পেরিয়ে কার্তিকপুজো পর্যন্ত বর্ধমান, বীরভূম আর মুর্শিদাবাদের কত গ্রামে যে তাঁদের কবিগানের ডাক পড়ে! বলতে গেলে এ ক'দিনের গাওনা থেকেই তাঁদের কিছু অর্থ সঞ্চয় হয়, পরিবারের জন্যে নতুন জামা-জুতো ও শাড়ি-গামছার সংস্থান হয়। তার চেয়ে বেশি প্রাপ্তি অবশ্য সাধারণ শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত ভালবাসার স্বীকৃতি। তারা গানে মুগ্ধ হয়ে আসরে উঠে পঞ্চাশ বা একশো টাকার নোট বুকে সেফটিপিন দিয়ে এঁটে দেয়। কিংবা পরিয়ে দেয় মেডেল। অন্যথায় মকবুল সারা বছর তাদের গ্রামের মসজিদের মাইকে আজান দেন—সেটাই তাঁর শীর্ণ জীবিকা। আর সর্বেশ্বর একটা হিমঘরের ম্যানেজারি করেন। শরতের গ্রামীণ মেলা আর উৎসবে তাঁদের ক'দিনের মুক্তি আর মানবস্বীকৃতি। নানা পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে তাঁদের দু'জনে দুই প্রতিপক্ষ সেজে আসর জমান ঢোল-সহরতে। হিন্দু আর মুসলমান, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতে পোক্ত—ওঁদের কাছে থাকে 'ভক্তমাল' নামের বইটি। পরনে থাকে ধুতি ও পাঞ্জাবি আর কাঁধে থাকে সস্তা তসরের চাদর পাট করা। কবিগানের বিষয় থাকে হয়তো কর্ণ আর অর্জুন, কৃষ্ণ ও নারদ, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির—এই ধরনের। গানে-কথনে হালকা নাচে পাঁচ ঘণ্টার আসর জমজমাট—মঞ্চে তাঁরা ক'ঘণ্টার শাহেনশা।

ভাদ্রের মাঝামাঝি থেকে এ ধরনের কত গ্রামিক সংগঠন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক, বর্ধমানের 'মহাপ্রভু কীর্তন বারিধি' বা নদিয়ার 'জগমোহিনী কীর্তন পার্টি'। এদের সংগঠক একজন জাতিবৈষ্ণব আখড়ার ঝানো স্বভাবের মোহান্ত। আশ্বিন থেকে পৌষ—মানে, কেঁদুলির মেলা পর্যন্ত এদের পরিযায়ী সংসার গ্রামেগঞ্জে, পুজোপ্রাঙ্গণে চলেছে গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে। হারমোনিয়াম, বাঁশি, মৃদঙ্গ আর বেহালাদার হলেই আগে চলে যেত, এখন তার সঙ্গে জুটেছে ক্যাসিও। একুনে দাঁড়াল পাঁচজন আর অধিকারী মশাই কীর্তন কলানিধি গোবর্ধন দাস। রাধা ও চন্দ্রাবলী করবে ঝুনু আর রূপা। গোবর্ধনের গ্রাম থেকে রিক্রুট করা। পাঁচ মাসের পেটভাতা আর নগদ দু'হাজার টাকা মাসিক বেতন—এবার চালাও পানসি এ জেলা থেকে ও জেলা। কতগুলো আসর বসবে তার দায়িত্ব অধিকারীর। একেকটা পালাকীর্তন চলে দু'ঘণ্টা। কেঁদুলির মেলায় সাতদিনে প্যান্ডেল করে দিনে-রাতে অন্তত দশটা আসর। গাইতে গাইতে গলা চিরে যাওয়ার জোগাড়, তবু ঝুনু আর রূপা বেশ খুশি—হাতে কিছু কাঁচা পয়সা এসেছে। যদিও বেতনের অর্ধেকমতো আন্দাজে হিসেব করে ওদের বাবাকে অ্যাডভান্স দিয়ে এসেছে অধিকারী। ভেবে দেখলে এটা ঝুনু আর রূপার চমৎকার একরকম এক্সকারশন। সারা বছর তো ঠোঙা বানায় কিংবা সেলাইকল চালায়। দু-চারজন গ্রাম্য যুবার প্রচ্ছন্ন চোখ মারা কি আর তাদের চোখে পড়ে না? ভালই তো লাগে। সত্যি কথা বলতে কী, রাধা আর চন্দ্রাবলীর সাজের ভেতরে তাদের তো একটা স্বপ্নময় নারীত্বের সত্তাও আছে। মাথুর পালায় তাদের অন্তর্বেদনা যেন শরীরী আহ্বানে জেগে ওঠে। তাদের কাছে শরৎ মানে, যেন জীবনের উষ্ণতা। আহা, তাদের যেন শরতের শেষ না আসে!

নকশালরাই তো মাও-এর ভাবশিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁদের তো মাওবাদী বলা হত না। গত দশ বছরে সেই অন্ধ্র থেকে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে যাঁদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের মাওবাদী বলে চিহ্নিত করা হল।



গতবার কমল চক্রবর্তী এবং তার 'আলোপাহাড়'-এর কথা আপনাদের বলেছিলাম। সেখানে যাচ্ছি শুনে বন্ধুরা সতর্ক করেছিলেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? আর যাওয়ার জায়গা পেলে না? ওসব অঞ্চলে মাওবাদীরা কিলবিল করছে। তোমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে যদি মোটা মুক্তিপণ চায় তা হলে টাকা দিলেও তুমি ফেরত আসবে কি না তাতে বিলক্ষণ সন্দেহ থাকছে। যেও না ভাই।'

স্বীকার করছি, অস্বস্তি যে একদম হয়নি তা নয়। কমলের বন্ধু ধূর্জটি টেলিফোনে আমার আশঙ্কাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিল, 'দাদা, ঘুরে আসুন।'

প্রথমে ঠিক ছিল গালুডি স্টেশনে নেমে ওখানে পৌঁছব, মাত্র তিন কিলোমিটার পথ। দেখা গেল খুব ভোরে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরতে হবে গালুডিতে নামতে হলে। তারপর আর কোনও দৈনিক ট্রেন ওখানে দিনেরবেলায় থামে না। তাই নেমেছিলাম ঘাটশিলায়, পথ বেড়ে গিয়েছিল আরও দশ কিলোমিটার।

যাওয়ার আগে ম্যাপ দেখেছিলাম। কাছাকাছি জায়গার নাম বান্দোয়ান। এই নামটি প্রায়ই খবরের কাগজে পড়েছি। মাওবাদীদের ডেরা। প্রায়ই খুন হয় ওর চারপাশে। জঙ্গলমহল থেকে কিছুটা দূরে হলেও পুরুলিয়ায় ওই এলাকা ঝাড়খণ্ডের গা ঘেঁষে রয়েছে। মাওবাদীদের মুক্ত অঞ্চল বলা যেতে পারে।

নকশালদের আন্দোলনের অনেক পরেও আমি মাওবাদীদের কথা আলাদা ভাবে শুনিনি। নকশালরাই তো মাও-এর ভাবশিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁদের তো মাওবাদী বলা হত না। গত দশ বছরে সেই অন্ধ্র থেকে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে যাঁদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের মাওবাদী বলে চিহ্নিত করা হল। কিন্তু যখন ধরা পড়ে যাওয়া মাওবাদীদের ছবি কাগজে ছাপা হয় তখন আমি খুব অবাক হই। প্রায় প্রত্যেকেই ক্ষীণ শীর্ণ, দেখেই বোঝা যায় দারিদ্রসীমার অনেক নীচে তাঁদের অবস্থান। দু'বেলা খেতে না পাওয়া মানুষগুলো রাইফেল থেকে একে ফর্টিসেভেন চালান, ডিনামাইট ফাটান, বিশ্বাস করতে খুব অসুবিধে হয়। কিন্তু এই কাজগুলো করার অপরাধে ধরা পড়ে যান তখন অবিশ্বাস করার কোনও কারণ থাকে না। বামফ্রন্ট আমলে এঁরা পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারি লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াচ্ছেন। এত শিক্ষিত বাহিনীর সঙ্গে শিক্ষাবিহীন গরিব মানুষগুলো কী করে পেরে উঠছেন তা জানতে চাইলে শুনেছিলাম, বনজঙ্গলে নাকি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে। তখন প্রশ্ন জাগত, এই যে ট্রেনিং স্কুল চলছে তার খবর সরকারি লোকের কাছে পৌঁছচ্ছে না কেন?

মাওবাদী আন্দোলন, তাঁদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা, পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষের কথা আমরা খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারি। কেউ বলেছেন অত্যন্ত অভাবের কারণে, সরকারের সাহায্য না পাওয়ায় এলাকার অনেক মানুষ মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই অভাবগুলো দূর করলেই আন্দোলন থেমে যেতে বাধ্য হবে। তাই প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সস্তায় পাঠাও, স্কুল কলেজ করে দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। বামফ্রন্টের আমলে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলতেন, মাওবাদী বলে কিছু নেই, ওঁরা সব সিপিএমের ক্যাডার। সিপিএমের তখন এত দুর্নাম যে আমরা মনে করলাম নেত্রীর বক্তব্য সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন বাদে তিনিই ওঁদের মাওবাদী বলেই ঘোষণা করলেন। সিপিএমের ক্যাডার বলার অভ্যেস ত্যাগ করলেন। মাওবাদীদের রাষ্ট্রীয় সুবিধে দিয়ে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েও যখন খুনখারাপি বন্ধ করতে পারলেন না তখন তিনি প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। খবরের কাগজ পড়ে জানলাম মাওবাদী এবং সরকারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে কয়েকজন মানুষ সক্রিয় হয়েছেন। সরকার তাঁদের গুরুত্ব দিচ্ছেন। অর্থাৎ সরকারের পুলিশবাহিনী যাদের খুঁজে পাচ্ছে না তাদের সঙ্গে এই মধ্যস্থতাকারীরা সরাসরি যোগাযোগ রেখে সরকারকে বক্তব্য জানাচ্ছেন। দুটো দেশের মধ্যে লড়াই হলে তৃতীয় দেশকে যে ভূমিকা নিতে দেখা যায়। এই মধ্যস্থতাকারীরা যখন ভারতবর্ষের নাগরিক তখন তাঁদের কী অসীম ক্ষমতা যে মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে ডেকে আলোচনা করছেন, মাওবাদীদের বোঝাতে বলছেন! আমরা যারা খবরের কাগজ পড়ি তারা জানাই, সরকার যেখানে পৌঁছতে পারেন না এঁরা সেখানে স্বচ্ছন্দে পৌঁছন বলেই এমন গুরুত্ব পান। আজকের কাগজে

দেখলাম মাওবাদীরা এবং সরকার, দু'পক্ষই শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থতাকারীদের কাঠগড়ায় তুলেছে।

ঘাটশিলায় আমি গিয়েছিলাম তিরিশ বছর আগে। টেবো পাহাড়ে থাকার জায়গা না পেয়ে ফিরে আসার পথে ওখানে রাত কাটিয়েছিলাম। বিভূতিভূষণের স্মৃতিজড়িত ঘাটশিলায় একসময় বাঙালিরা শীতের ছুটিতে যেতে ভালবাসতেন। বাঙালির পশ্চিমের প্রথম দরজা যদি ঝাড়গ্রাম তা হলে ঘাটশিলা দ্বিতীয়। তিরিশ বছর আগে জায়গাটার বেশ রমরমা ছিল। ট্রেন থেকে যাত্রীরা বের হলেই প্রচুর রিকশার হর্ন বাজত। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার, তৃপ্ত

দুটো খাবারের। সিগারেটের দোকানদার ছয়মাস আগের তৈরি প্যাকেট বিক্রি করতে বাধ্য হয় কারণ নিয়মিত বিক্রি হয় না। স্টেশন চত্বর থেকে শহরে ঢুকলে মনে হল এখানে আমি আগে আসিনি। শহরটি এখন অর্ধমৃত। বিখ্যাত সেই মিষ্টির দোকানটি রয়েছে। তার মিষ্টিগুলোও। কিন্তু দোকানের যুবক মালিক আক্ষেপ করলেন, 'এখন তো এখানে ট্যুরিস্ট আসে না। বাবার কাছে শুনেছি শীতকালে প্রায় মেলা বসে যেত। সন্ধের পরে দিনের স্টক আর থাকত না আমাদের। এখন একজন বা দু'জন। কেউ আর শীতের ছুটি কাটাতে পরিবার নিয়ে এখানে আসেন না।'



মানুষের মুখ দেখা যেত। তখনও প্রচুর বাড়ি দেখেছিলাম যা বাঙালিরা শীতে ব্যবহার করার জন্যে যত্ন করে রেখেছিলেন। একটা ধর্মশালায় রাত কাটিয়েছিলাম। সেই প্রথম ধর্মশালায় নিশিযাপন। মন্দ লাগেনি। শুনেছিলাম হোটেল হয়েছে দু'টো। মনে হয়েছিল ছুটি কাটানোর পক্ষে জায়গাটা চমৎকার।

এবার দু'জন বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা, কয়েকটা সিগারেটের দোকান,

কেন আসেন না? দুটো কারণ। সময় যত এগোচ্ছে তত মানুষের জীবনযাপনের প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে। চল্লিশ বছর আগে বাঙালি পশ্চিম বলতে ঘাটশিলা, মধুপুর, দেওঘর, গিরিডি বুঝত। এখন বোঝে আমেরিকা। যে টাকায় মুম্বই ঘুরে আসা যায় তার থেকে অনেক কম টাকায় কুয়ালালামপুর বেড়িয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এখন দশ দিন সপরিবারে শুধু টেনশনহীন হয়ে থাকতে

ঘাটশিলায় যেতে চাইলে ছেলেমেয়েরা তো বটেই, স্ত্রী-দের মুখ হাঁড়ি হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণ হল, মাওবাদীদের আন্দোলন, পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ, বিচ্ছিন্ন ধরনের খুন। এগুলোর কারণে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সাধ করে কেউ তার শরিক হতে চাইবে না। একসময়ে ঘাটশিলা বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ছিল। এখন খুব কম ট্রেন ওখানে থামে। চারধারে কৃত্রিম ভয়ের বাতাবরণ। আর এই কারণে শহরটি ক্রমশ মৃত হয়ে যাচ্ছে।

ঘাটশিলা থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে গাড়ি কিছুটা যেতেই চেঁচিয়ে উঠলাম। গাড়ির চাকা পাতাল থেকে স্বর্গে উঠছে। তার ঝাঁকুনিতে সর্বাঙ্গে ব্যথা ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওইটে নাকি ন্যাশনাল হাইওয়ে। এমন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সর্বত্র বিশাল বিশাল গর্ত কেন? অবিকল এইরকম রাস্তা রয়েছে শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির মধ্যে। ওই একমাত্র হাইওয়েটিতে এগারো মাস চাকবাস করা যায়। এক মাসে যেটুকু কাজ হয় তা বৃষ্টি পড়লেই ধুয়ে পরিষ্কার। মজার কথা, কাজটা শুরু হয় ঠিক বর্ষার আগে। মোটা টাকার কাজটার বৎসামান্য অংশে রাস্তার জন্যে খরচ করে কন্ট্রাক্টর তৃপ্তির হাসি হাসেন। অবশ্য তাঁর হাসির অংশীদার ওঁর কাজ তদারকি করার জন্যে যে সরকারি অফিসাররা রয়েছেন, তাঁরা। মাননীয় জাহাজমন্ত্রীকে এই কাগজের মাধ্যমে অনুরোধ করেছিলাম আর ওঁদের পকেট ভারী করার সুযোগ না দিয়ে পুরো পথটা খুঁড়ে নতুন চালাবার ব্যবস্থা করুন। অনেক টাকা বেঁচে যাবে। গাড়িগুলো রক্ষা পাবে, মানুষও স্বস্তিতে যাতায়াত করতে পারবেন।

ঘাটশিলা থেকে বেরিয়ে সেই একই রাস্তা দেখতে পেলাম। গাড়ির গতি এখন ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার। নরকযন্ত্রণা একটু কমল—যখন হাইওয়ে ছেড়ে গাড়ি একটু সরে পিচের পথ বেয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। তখন দু'পাশে বেশ ভাল জঙ্গল। তার গুল্ম এবং গাছগাছালি আমার পরিচিত। আবাল্য ডুয়ার্সে এদের দেখে এসেছি। অন্যমনস্ক ছিলাম, হঠাৎ মনে হল কেউ একজন ছুট করে গাছের আড়ালে চলে গেল। শেষ মুহূর্তে যেন তার হাতে একটা লম্বা নল দেখতে পেয়েছিলাম। কাপসা, তবু মনে হল লোকটি গামছায় মুখ ঢেকে রেখেছে। সোজা হয়ে বসলাম। যার আতিথ্য নিতে এসেছি সেই কমল চক্রবর্তী নির্বিকার। তাকে ব্যাপারটা বলতে গেলাম, সে হাত তুলে নিঃশব্দে জানিয়ে দিল, থাক না। এই গাড়ির চারপাশে 'ভালো পাহাড়' শব্দ দু'টো লেখা রয়েছে। শুনেছিলাম, এই শব্দ দু'টোই আমাদের মতো আগন্তুকদের রক্ষাকবচ।

পাহাড় ডিঙিয়ে ভনলাম সরু পথ ধরে যে গাছগাছালি ঘেরা আশ্রমে পৌঁছেছিলাম, যাকে কমল বৃক্ষনাথের আশ্রম বলে থাকে, তার গেটের সামনে। দেওয়ালে লেখা ভালো পাহাড়।

এইরকম মাওবাদী অধ্যুষিত জায়গায় কয়েক লক্ষ গাছ, দশটি গরু, হাঁস আর পুকুর নিয়ে কমল এবং তার সহযোগীরা বাস করছে। প্রতিদিন একশো সত্তরটি শিশু ও বালককে দূরদূরান্ত থেকে স্কুলের বাস তুলে নিয়ে আসে। পড়ায়, খাওয়ায়, গান শেখায়। সেই নার্সারির শিশুরা এখন ক্লাস এইটের ছাত্র। আমরা যাদের পাগল বলি, সেই প্রদীপবাবু বা জয়ন্তীর মতো মেয়ে ভাল চাকরির নিশ্চয়তা ছেড়ে চলে এসেছে বৃক্ষনাথের আশ্রমে ওই মানুষ গড়ার কাজে। আমার জানার আগ্রহ ছিল মাওবাদীরা ওদের জীবনে কোথায়?

জানতে পারলাম, ভালোপাহাড় নামক ওই বৃক্ষনাথের আশ্রমের দুই কিলোমিটারের মধ্যে অন্তত দশজন মানুষ খুন হয়েছেন। এঁরা কেউ সভাধিপতি, কেউ পঞ্চায়েত সদস্য, কেউ ব্যবসাদার। কারা খুন করেছে তা বলার দরকার হয় না। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। যদি কখনও শোনেন, সমুদ্রের মাঝখানে নোনাজলের মধ্যে খানিকটা মিষ্টিজল জেগে উঠেছে, নোনাজল তাকে গ্রাস করছে না, তা হলে যে বলবে এই কথা তাকে উন্মাদ না ভেবে উপায় নেই। কিন্তু আমরা কি পৃথিবীর সব রহস্য ভেদ করতে পেরেছি? মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কোথায় যায় তা জানার কোনও উপায় নেই। কিন্তু বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্য দূর করার অনেক চেষ্টা হয়েছে, সাফল্য পাওয়া যায়নি। পরিযায়ী পাখিরা হাজার হাজার মাইল কী করে ঠিকানা চিনে যাওয়া-আসা করে তাও আমাদের কাছে রহস্যময়। মিষ্টিজল নোনাজলের মধ্যে থেকে গেলেও তো যেতে পারে।

এসবের চেয়ে ভালোপাহাড়ের বৃক্ষনাথের আশ্রম তার নিজস্ব শান্তি নিয়ে থেকে গিয়েছে, এটা বোধহয় বেশি বিস্ময়কর। কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি। কেউ বলেছেন, ওই যে অভিজাত সংসারের শিশুরা এসে পড়াশোনা শিখছে, দুপুরে পেট ভরে খাচ্ছে, গানের ক্লাসে আলো আমার আলো গাইছে, ভালোপাহাড় তৈরি না হলে কখনই সম্ভব হত না। আগের প্রজন্মগুলোর মতো তারাও প্রায় পশুর মতো বড় হত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে। আজ ওরা বাড়ি ফিরে মা-বাবাকে শেখাচ্ছে কাকে ক কাকে খ বলে। হয়তো দেখা যাবে যাঁদের মাওবাদী বলা হয় ওরা তাঁদের পরিবারের সন্তান। কেউ কি কখনও নিজের সন্তানের সর্বনাশ করতে চায়? সে কারণেই চারপাশে আগুন জ্বালালেও ভালোপাহাড়কে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মত হল, পনেরো বছর আগে জায়গাটা ছিল ধু-ধু কাঁকর ভরা জমি। সেখানে ঘাস হল, গাছ বড় হল একটু একটু করে, শ্যামল চেহারা পেল জায়গাটা। নিজেদের ভূমিতে এমন জায়গা পেয়ে হয়তো মানুষের মনে মায়া তৈরি হল।

তিন নম্বর মত হল, একদিন বা কয়েক মাস নয়, বছরের পর বছর ধরে এলাকার মানুষ লক্ষ করেছে ভালোপাহাড়ে কোনও রাজনীতি করা হয়নি। কমল বা তার সঙ্গীরা পঞ্চায়েত বা বামফ্রন্টের নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে সহরম করতে যায়নি। আর তার ফলে পুরুলিয়ার জন্যে বরাদ্দ টাকা ফেরত গিয়েছে কিন্তু ভালোপাহাড়ের জন্যে সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি।

তিনরাত তিনদিন ছিলাম ভালোপাহাড়ে। মাইল আটেক দূরে প্রচুর খরচ করে একটি নিভারগিরি ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। সেখানে লোকজন অবশ্যই থাকতে পারে, আমার চোখে পড়েনি।

প্রথমদিনের শেষ বিকেলে একটা হাটে গিয়েছিলাম। তখন হাট শেষ হয়ে আসছে। সামনে একটা পোড়া বাড়ি। জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই কে পোড়াল। একেবারে সাধারণ অথচ প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি হচ্ছিল সেখানে। হাঁড়িয়া নিয়ে দোকান সাজিয়েছে এক বৃদ্ধ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কেমন বিক্রি হল?' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'এখন আর আগের মতো বিক্রি হয় না।' শুনে ভাল লাগল।

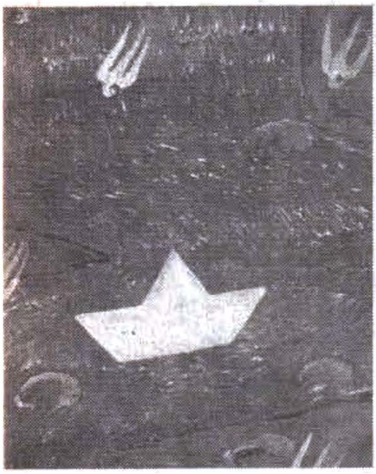
পরের দিন কমল একটি অটোরিকশায় বাজারে যাচ্ছিল, সঙ্গী হলাম। পাহাড়ি পথ, জঙ্গল পেরিয়ে যে জনপদে পৌঁছলাম তার নাম বান্দোয়ান। শুনেই চমকে উঠেছিলাম। খবরের কাগজ এই নামটির কথা প্রায়ই বলেছে। মাওবাদীদের সন্ধানে পুলিশ বান্দোয়ান তছনছ করেছে বহুবার তবু তাঁরা এর চারপাশেই খুন করে গিয়েছেন একের পর এক। দেখলাম, সাদা দাড়ি, সাদা ফতুয়া, ধুতি পরা কমলকে নমস্কার করল অনেকেই। কমল আমাকে অপেক্ষা করতে বলে দোকানে দোকানে কেনাকাটা করতে গেল। একজন প্রৌঢ় এবং যুবক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কলকাতা থেকে এসেছেন?' উচ্চারণ বলে দিল ওঁরা এলাকার মানুষ। 'হ্যাঁ' বললে প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার সময় রাস্তার অবস্থা তো দেখলেন। কন্ট্রাক্টর পাল্টায়, সরকার বদল হয়, তবু রাস্তার গর্তকে পাকাপাকি কখনওই সারানো হয় না। আমাদের জন্যে নাকি অনেক টাকা বরাদ্দ হয়, সেগুলো কোথায় যায় কে জানে।'

কমল এসে সবজি এবং মাছের বাজারে নিয়ে গেল। পশ্চিমবাংলার অন্য বাজারগুলোর সঙ্গে দাম ছাড়া কোনও পার্থক্য নেই। দাম অবিশ্বাস্য রকমের কম। কেন? এখানকার কোনও কিছুই তো বাইরে যায় না। আর এখানকার মানুষের কেনার ক্ষমতা প্রায় শূন্য। মানুষজন আমাকে দেখছিল। যেভাবে ভিনগ্রহের মানুষ এলে আমি দেখতাম। ফেরার সময় এক বৃদ্ধ একটি লাউ উপহার দিলেন, ভালোপাহাড়ের বাচ্চাদের খাওয়ার জন্যে। আচ্ছা, এই বৃদ্ধ কি জঙ্গলে লুকিয়ে পড়া সেই বন্দুকধারীর আত্মীয়?

 বাণী বসু

অষ্টম গর্ভ

প্রাচীন যুগের এক বিখ্যাত প্রেমিক কর্মক্ষেত্রে চলে যাওয়ার সময়ে প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে যাননি। আজকের রাধাকে যখন আজকের কৃষ্ণ ডেকেছে তখন বৃষভানুনন্দিনী অসমসাহসী এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে, এটুকুই প্রোগ্রেস।



বিংশ অধ্যায়
চিঠি

শীতের বেলা। বিকেল হতে না হতেই আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি এসে বিদ্যা লেটার বক্স থেকে ইউনিয়ন জ্যাক দাগানো এরোগ্রামটা পেল। হাতেরলেখাই বলে দিচ্ছে এ চিঠি পাবনের নয়। সে ব্যাগের মধ্যে ভরে নিল চিঠিটা। না হলে সবাই মনে করবে পাবনের চিঠি, দেখতে চাইবে, পড়তে চাইবে।

কিন্তু চিঠিটা অতীশেরও না।

প্রিয় বিদ্যা, আমি বুঝতেই পারছিস, এখন ইংল্যান্ডে, খোদ লন্ডনে। আমি রৌশন আলির সঙ্গে চলে এসেছি। তুই ব্যাপারটা জানিসই না, তাই তোকে বুঝিয়ে বলি। রৌশনের সঙ্গে আমার গানের সূত্রে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওর কাছে আমি তালিমও নিচ্ছিলুম। রৌশন কে বুঝতে পেরেছিস তো? সরোদ বাজায়। আলি আকবরের শিষ্য। দুর্দান্ত বাজায়। ইয়াং ম্যান, গানবাজনার লাইনের লোক। বাবার খুব আপত্তি উঠতে লাগল। হুট করে বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। তার পরের ঘটনা তুই জানিস। এই রকম একটা বিয়ে দেওয়া কি বাবার উচিত হয়েছিল? তুইই বল। অনেকেই কিন্তু সে সময়ে বলেছিলেন এত বয়সের ডিফারেন্সে বিয়ে উচিত নয়। আমাদের বাড়িতে বাবার কথাই শেষ কথা। বললেন—অনেক গানবাজনা হয়েছে, এবার ঘরসংসার করো। আমাকে মেনে নিতে হল। ফিরে এসে দেখলুম মা ছাড়া আর কেউ আমার পক্ষে নেই।

শুধু তুই নয়, বাবা সব্বার সঙ্গে আমার মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন, গানবাজনা শেষ। বাড়িতে বসে শুধু চা করি আর পান সাজি, বাবর হুকুম হল রোজ একটা করে পদ রেঁধে সবাইকে খাওয়াতে হবে। আমি আর পারছিলাম না। ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। তারপর অনেক কষ্টে আমাদের স্কুলেই একটা কাজ জোগাড় করলুম, একটু ছুটি। হাতে সামান্য কিছু পয়সা! এই সময়ে রৌশন একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল। ওকে সব বললুম। ও লন্ডনে একটা চান্স পেয়েছে। আমাকে বলল—চলো, চলে যাই। বিদ্যা তুই রাগ করিস না, ভুল বুঝিস না, গান ছাড়া আমার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব। মা আমাকে একটু সাহায্য করেছেন, কিন্তু রৌশনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মা-ও খুব দ্বিধায় আছেন। আমি সত্যিই জানি না, এর পর আমার কপালে কী আছে। আপাতত রৌশনের বিবি। আমার এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য নিয়তি ছাড়া আর কেউ দায়ী থাকে তো সেটা আমি নই, আমার বাবা। উত্তর দিস। আমি যোগাযোগ রেখে যাব। শ্রীরাধা।

জাঁকিয়ে শীত পড়ছে। তবু ছাত ছাড়া তার উপায় নেই। লাল উলের শালে মুড়িসুড়ি দিয়ে সে ছাতে উঠে যায়। কী অদ্ভুত! শুদ্ধু গানটা ছাড়া ওর আদ্যন্ত ছিল একেবারে রক্ষণশীলের চূড়ান্ত! শাড়ি পরবে কাঁধের ওপর দিয়ে আঁচল ঘুরিয়ে। কত দিন যে বেড়াবিনুনি বেঁধেছে। সে হাতে রিস্ট ওয়াচ পেল বিএ পড়তে গিয়ে। শ্রীরাধা বলল—তুইও রিস্ট ওয়াচ ধরে ফেললি? ওর গলায় সমালোচনার সুর।

অত্যন্ত শান্ত, মগ্ন মুখশ্রীর মেয়েটি লাজুক ছিল, একমাত্র গানের সময় ছাড়া।

সে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারল?

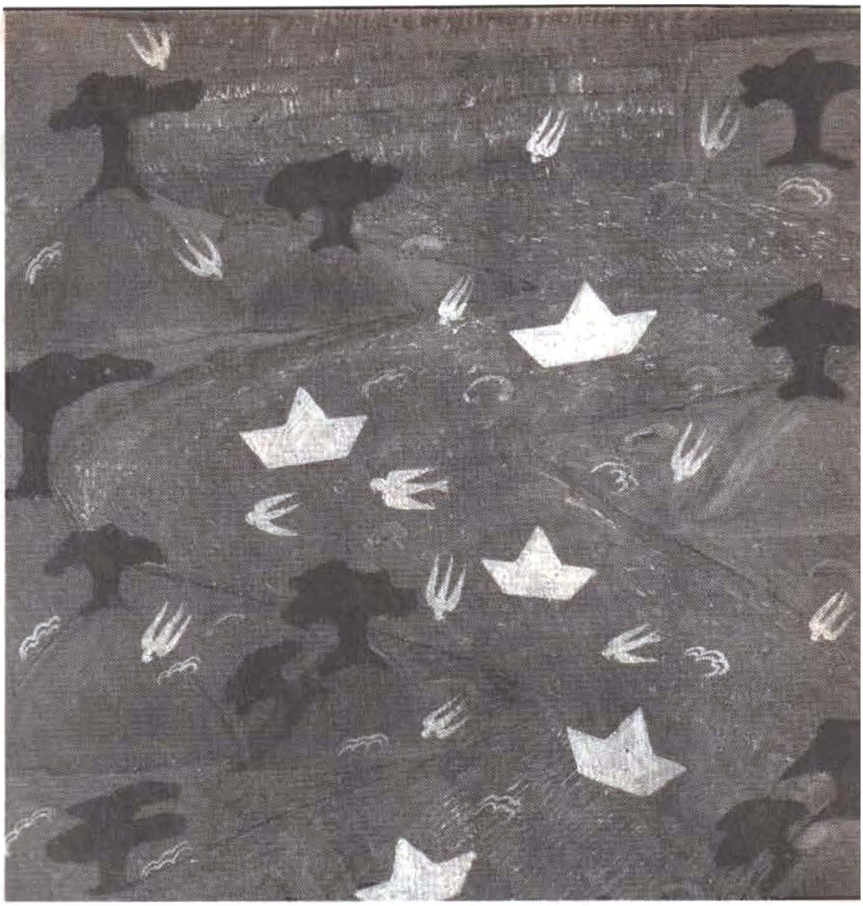
সে কি পারবে?

পারবে না।

কিন্তু তার পরিবার তো অন্যরকম! বুজবুজদিদির বেলায় বাবা একটা খুব কঠোর রক্ষণশীল ভাব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা ছাড়াও যে মা আছেন, দাদা দিদিরা, ভাইয়েরা, এ রকম পরিস্থিতি হলে সে তো মামার বাড়ি গিয়েও থাকতে পারে। শ্রীরাধার মামার বাড়ি কিন্তু গানবাজনারই বাড়ি। ওখানেও কি তবে ওর কোনও আশ্রয় ছিল না? তার বাড়িতে কি কেউ তার পছন্দ-অপছন্দ না জেনে ওরকম একজন বয়সে বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে? মনে তো হয় না।

সে মনে মনে একটা উত্তর লিখল রাধার চিঠির।

কোনও এক প্রাচীন যুগের এক বিখ্যাত প্রেমিক কর্মক্ষেত্রে চলে যাওয়ার সময়ে তাঁর প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে যাননি। আজকের রাধাকে যখন আজকের কৃষ্ণ ডেকেছে তখন বৃষভানুনন্দিনী অসমসাহসী এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে, এটুকুই আমাদের প্রোগ্রেস। রাধা তোকে অনেক অভিনন্দন, কিন্তু সেই সঙ্গে খুব চিন্তাও হচ্ছে। রৌশন আলি ভালো সরোদ বাজাতে পারেন কিন্তু মানুষ কীরকম, আমার তো কোনও ধারণাই নেই। তুই নিজেও কেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা লিখেছিস, তার নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। গান তোকে অনেক বড় জায়গায় পৌঁছে দেবে। শুধু ট্যালেন্ট নয়, তোর সেই প্যাশন আছে। নিজের জন্য একটা প্ল্যান তৈরি করে এগো। রৌশন যদি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তুই নিজের জন্য কর, কী করে করবি জানি না, তোর অনেক সোর্স আছে শুধু এটুকুই জানি। আমার ভাই পাবন এখন ওখানে আছে, ওর ঠিকানা, ফোন নম্বর দিলুম, যোগাযোগ করে নিস, সুবিধে হবে।



কাজলদি কি ডাকছে!

—ডাকছ না কি?

—কলেজ থেকে ফিরেই তুই ছাতে? তোর তো ভাবনা ধরলেই ছাতে ছুটিস! হলটা কী?

—ডাকছ কেন?

—ফোন।

সে তাড়াতাড়ি নীচে এসে ফোন ধরল—হ্যালো ও

ও দিক থেকে চাপা গলায় কেউ বলল—কানুদা খুব বিপদে আছে। তোমাদের কাছে খবরটা পৌঁছতে বলেছে। ইফ ইউ কেয়ার ওর কাছে যত তাড়াতাড়ি পারো পৌঁছও।

—ঠিকানাটা!

—বলছি, ভালো করে শুনে নাও,

সে দ্রুত লিখে নিল, অজানা নামধাম, অজানা অলি-গলি। কোনও গাছের পাশে চায়ের দোকান সেখান থেকে কত গজ...

—তুমি কে বলছ?

উত্তরে ফোনটা নীরব হয়ে গেল। সে হতভম্ব হয়ে গেল। এই ধরনের গোপনতা আগে কখনও দেখেনি, শোনেনি। কাজলদি জিগ্যেস করল—কে রে?

কাজলদি তার ওপর এই অভিভাবকগিরিটুকু করে থাকে। তার মুখের ভাব পড়ার চেষ্টা করে, মন্তব্য করে, তার বিরক্ত লাগে না কেন না কাজলদি সেই কোনকাল থেকে তার, তাদের মন বুঝে এসেছে, মূল্য দিয়েছে মনখারাপ মন ভালোর

বলতে খারাপ লাগল, তবু সে বলল—ও তুমি চিনবে না।

কিছুক্ষণ পরে বরুণ ফোন করল, সেও ওই একই বার্তা পেয়েছে। তাকে অতিরিক্ত বলা হয়েছে, পুলিশ খোঁজে আছে, তাকে ফলো করতে পারে, সে যেন সাবধানে আসে।

—কিছু বুঝতে পারলি কে করেছে?

—তুই পারলি?

—নাহ্, উপরন্তু চাপা গলায় কথা বলছিল। এত গোপনতার কারণ কী?

—মনে হচ্ছে এমন কেউ করেছে ফোনটা যাকে আমরা চিনি। ধরা দিতে চাইল না।

—আমরা কি ধরিয়ে দেওয়ার লোক?

বরুণ ক্ষুব্ধ গলায় বলল—এরা এখন যে পলিটিকসে মেতেছে তাতে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

পিজিতে এখন এমডি পড়ছে বরুণ, ওখান থেকে সোজা রাসবিহারী চলে এসেছে। কলেজের সামনে দেখা করে দেশপ্রিয় পার্কের বেঞ্চে বসে কথা বলছে। জায়গাটা বারাসত, স্টেশনের কাছে না বাসরাস্তার দিকে কেউই বুঝতে পারছে না। সময় চাই। বরুণ বলল—ভালো করে রাস্তাটা বুঝে নিয়ে তবে যাত্রা শুরু হবে।

—তুই কিন্তু একা একা রাস্তার খোঁজে চলে যাসনি, বুবু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

—না না, কলেজ থেকেই ক্যাজুয়ালি জেনে নেব। তুই জিনিসপত্রগুলো জোগাড় কর। বারো নম্বরে গিয়ে চুপচাপ তোতে-আমাতে মামুর কিছু জামাকাপড়, তুই রেজর আর শেভিং ক্রিম কিনে রাখবি।

বুবু বলল—ব্রাশ টুথপেস্টও, কে জানে দাঁত-ফাঁত ঠিক করে মাজে কি না।

—খাবার কী নেওয়া যায় বল তো?

বুবু বলল—শুকনো খাবারই ভালো—বিস্কিট, চকলেট, একটা হরলিক্স।

—কিন্তু ও বাড়ির খাবারের জন্যে হাঁ করে থাকবে।

—নেওয়া যায়, কিন্তু কী করে সবার চোখে ধুলো দিয়ে...

—সেটা তুই ভাব। কিছু বেসিক ওষুধপত্র আমি নিয়ে নেব। ও ছাড়াও আরও কেউ কেউ থাকতে পারে হয়তো ভুগছে, ইনজিওর্ড...

কেউ প্রশ্ন করল—কী ব্যাপার? ভাইবোনে এখানে চুপিচুপি কী

ষড়যন্ত্র করার?

চমকে মুখ তুলে ওরা দেখে শিবনাথদার মুখটা অন্ধকারে ফুটে উঠেছে।

—আপনি?

—আরে আমি তো এই পার্কের পেছনেই থাকি। রোজ না হলেও প্রায়ই পার্কে এক পাক ঘুরে যাই। কী ব্যাপার বলো তো? গুরুতর মনে হচ্ছে?

—কিছু না শিবনাথদা।

—বাড়ি থেকে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে এসে দুই ভাইবোনে মিলেছ, তারপরেও বলছ কিছু নয়! বিশ্বাস করতে পারছি না।

বুবু বলল—বলো। উই ক্যান ডিপেন্ড অন শিবনাথদা। আর কাউকে বলবেন না কিন্তু!

সব শুনে শিবনাথ চিন্তিত গলায় বললেন—সবই বুঝলুম কিন্তু হোয়াই বুবু?

—মানে?

—বরুণ আর কানু এক বাড়িতে থাকে, দু'জনে খুব ঘনিষ্ঠ, বরুণ একটু-আধটু পলিটিক্সও করেছে, তাকে কানু খবর পাঠাতেই পারে, বাট হোয়াই বুবু?

বুবু বলল—আপনি জানেন না, আমিও কিন্তু ওদের ক্লাস-টাস করেছি। দু-চারজন বন্ধু আমার কমিউনিস্টদের মধ্যেও ছিল। আমাকেও বলতেই পারে, তা ছাড়া বরুণ পাবন আমি আমাদের কথা সবাই জানে।

—এরা কিন্তু জাস্ট সিপিআইএম নয়। এরা নকশাল, কানু নকশাল, তারা কমিউনিস্টদেরও শত্রু মনে করে। আমার মতে তোমাদের যাওয়া উচিত নয়।

বরুণ বলল—এই জন্যেই আমি কাউকে বলতে বারণ করেছিলুম। এটা পলিটিক্যাল ক্ষেত্রের ব্যাপার নয়, একেবারেই ব্যক্তিগত। শিবনাথদা আই ক্যান গো এনিহোয়্যার ইফ মামু ইজ ইন ডেঞ্জার। আর এখন বুঝতে পারছি, ভীষণ বিপদে ছিল বলেই ও শেষ সময়ে নিশ্চিন্তাইয়ের কাছে আসতে পারল না। আই হ্যাভ টু গো। আমাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। তার গলায় জেদ।

বুবু বলল—আমি তো ওকে একলা ছাড়বই না।

শিবনাথ বললেন—তা হলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

—সে কী? আপনাকে ওরা বিশ্বাস করবে কেন! সর্বনাশ হয়ে যাবে শিবনাথদা। সবটা কেঁচে যাবে।

—তোমাদের হাতে তো কোনও অস্ত্র-টস্ত্রও থাকবে না।

—অস্ত্র বলতে রিভলভার তো পাব না। কিন্তু লাঠি-টাঠি ছুরি ছোরা নিলেও কি ব্যবহার করতে পারব?

প্রশ্নই ওঠে না। আর দরকারই বা কী? মামু বিপদে আছে মানে আমাদের ওর জন্যে খাবারদাবার, জামাকাপড় এ সব নিয়ে যাওয়া দরকার। মামুর সূত্রেই নকশালরা আমাদের বন্ধু, অস্ত্র দরকার হলে আমাদের জানাত। শিবনাথ উঠে পড়লেন—তা হলে আর কী করব, একান্তই যখন যাবে। কিন্তু দরকার হলে আমায় বলো। কবে কখন যাচ্ছ...মানে ঠিকানাটা যদি দিয়ে রাখো অন্তত...না দিতে চাও থাক, কিন্তু দিয়ে গেলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারা যেত। আমি আবার লাঠি-টাঠি, ছুরি ছোরা চালাতে পারি। যুযুৎসু জানি। শখ করে শিখেছিলাম।

বরুণ বলল—কথাটা গোপন রাখবেন শিবনাথদা প্লিজ। বুবু বলল তাই, আমি হলে আপনাকেও বলতুম না।

সেদিন বাড়ি এসে আরেকটা ইউনিয়ন জ্যাক পেল বুবু। খোলা।

মা বললেন, আমি পাবনের চিঠি ভেবে খুলে ফেলেছিলুম বিদ্যা। এই নে।

মায়ের চোখ বুবুর ওপর স্থির হয়ে আছে। কোনও তিরস্কার নেই, কৌতূহল নেই, তার মনে হল মা'র চোখ দু'টো অনন্ত করুণার আকর। তবু এত বুক টিপটিপ করার কী আছে! সে ভেবে পায় না। মা খুলেছেন, মায়ের দোষ নেই, ডান দিকে হেলানো লেখা, অনেকটা পাবনেরই মতো। যে মুহূর্তে বুঝেছেন পাবনের নয়, অমনি রেখে দিয়েছেন।

ইংরেজিতে লেখা চিঠি। অতীশ লিখছেন

বিদ্যা, চিঠি দিতে দেরি হয়ে গেল। এখানে এসেই প্রচণ্ড পেট ব্যথা। অ্যাপেন্ডিসাইটিস। অপারেশন হল। বিজনেস স্কুল জয়েন করতে এক সেমেস্টার দেরি হয়ে গেল। মাঝে আর একটা ছোট্ট কোর্স করে নিচ্ছি জার্নালিজমের। তোমার কী খবর? নিশ্চয় কলেজের কাজে ডুবে গেছ। লিখছ না কি? গানের কী খবর? সুরঙ্গমা? আমার মা আমার কাছে এসে রয়েছেন। বাই।

অশোকা চ্যাটার্জি কাছে রয়েছেন বলেই কি এর চেয়ে বেশি, এরচেয়ে ভালো চিঠি লিখতে পারলেন না অতীশ? বড় কেন আশাহত হল সে। মনের ভেতরটা চুপ হয়ে গেছে।

রাধার চিঠিটা যতই আকস্মিক, অবাক করা হোক, তার একটা উত্তর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে আসতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু এ চিঠিটা আকস্মিকও নয়, এর মধ্যে আশ্চর্য করার কোনও উপাদানও নেই। তার মনে কোনও লিখন উসকে উঠছে না। অতীশের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে সে শুধু অনেক কিছু জানতে পারত তাই-ই নয়, নতুন করে চিনত নিজেকেও। সেই রং-বেরঙের অতীশ এইরকম একটা ম্যাটমেটে চিঠি লিখবেন? আবার ভাবতে ভাবতে তার মনে হল ওই যে আমার মা আমার কাছে এসে রয়েছেন—এটা একটা বার্তা হতে পারে, একটা ব্যাখ্যা। হয়তো উনি তাকে এ কথাও বলতে চাইছেন যে এ চিঠির উত্তর না দিলেও চলবে, বরং না দেওয়াই ভালো। অতীশ মা-কে এত ভয় পান? একজন বছর ত্রিশের যুবক যে নানা রকমের পড়াশোনা ও ট্রেনিং-এর শেষে স্বাধীন উপার্জন করছে, তার মা-কে এত ভয়? আর ভয় কেন? অশোকা চ্যাটার্জি কি বুবুকে পছন্দ করছেন না? না করার কারণ ঠিক কী?

রাতে শুতে এসে মা জিগ্যেস করলেন, অতীশ কে রে? ইংরেজিতে লেখা বলে আমি নামটা দেখলুম—অতীশ। পাবন তো বাংলাতেই লেখে..

—একজন বন্ধু মা স্টেটসম্যান-এ লেখেন মাঝে মাঝে। তোমাকে দেখাব এরপরে বেরলে।

একটু পরে মা বললেন—তুই আর লিখছিস না?

—বেশ কিছুদিন হয়নি লেখা।

—লেখা বন্ধ করতে নেই বিদ্যা।

—কিছু যে মনে আসে না, যা বা আসে মনে হয় খুব তুচ্ছ। লেখার যোগ্যই নয়।

—তুচ্ছ বলে কিছু নেই বিদ্যা, যা মনে হবে বাছবিচার না করে লিখে যাবি। কলমে শান দেওয়া থাকবে।...ছেলেটি কি তোর খুবই বন্ধু? বাঙালি নয়? ইংরেজিতে লিখেছে কেন?

—ও আধা পাঞ্জাবি মা। বাংলো বলে খুব ভালো, লিখতে বোধহয় তত পারে না।

—এর কথা আমাকে তো কিছু বলিসনি!

সে বলল—কতই তো আলাপী আছে, সকলের কথা কি তোমাকে বলি?

—বলিস না-ই বা কেন? না বললে মনে হয়...আমার আর কোনও মানে নেই।

সে মা-কে জড়িয়ে ধরল। এমন অভিমানের কথা মায়ের মুখে কোনওদিন শোনেনি। বলল—বলবার মতো হলে বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু সেরকম কিছু হচ্ছে না মা।

—কী পারছিস? সে মাথা নাড়ল মায়ের বুকের মধ্যে।

—এখন এরকম হয়তো অনেক হবে বিদ্যা। হয়ে থাকে। আগেকার দিন তো আর নেই। খালি একটা কথা বলি—কারও পেছনে দৌড়বি না। প্রাণপণে নিজেকে ঠিক রাখবি। যে দৌড়ে আসছে, তার দিকে ফিরে চা। যদি মন চায় সেখানেই নোঙর করবি।

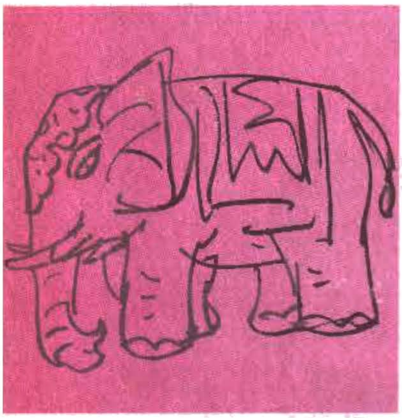
(ক্রমশ)

ছবি : শ্রীলা বণিক

bani_basu@yahoo.in

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

বহুভর্তৃকতা মেয়েদের কাছে যথেষ্টই কাম্য। দ্রৌপদীও পাঁচ-পাঁচজন উপভোক্তা বা উপভোগক্ষম পুরুষকে পেয়েছিলেন স্বামী হিসেবে। তা হলে. কর্ণের প্রশ্ন ছিল যেটা, তিনি তাঁদের ছেড়ে থাকবেন কেন?



দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিয়ে হওয়ার পর পাঞ্চাল দ্রুপদ প্রচুর যৌতুক দিলেন পাণ্ডবদের। দান-সামগ্রীর মধ্যে মহার্ঘ বস্ত্র-অলংকার থাকবে. এটা স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু পাণ্ডবদের যেটা প্রয়োজন ছিল, সেটা বোধহয় দ্রুপদ একটু বেশিই বুঝে গিয়েছিলেন, যদিও তিনি সেটা জামাইদের বুঝতে না দিয়েই প্রদান করেছিলেন। নানা জিনিসের সঙ্গে দ্রুপদ একশোটা রথ দিলেন পাণ্ডবদের। প্রত্যেকটি রথের বেশ খানিক অংশ সোনায় মোড়া, প্রত্যেকটি রথে ঘোড়া জোতা ছিল চার-চারটে এবং তাদের প্রত্যেকটির লাগাম সোনার তৈরি—শতং রথানাং বরহেমমালিনাং/চতুর্যুজাং হেমখলীনশালিনাম্। দ্রুপদ হাতিও দিলেন প্রচুর এবং সেগুলোরও মাথার অংশটুকু সোনায় ঢাকা। আর দিলেন একশো দাসী, যাদের যৌবন বড় বেশি চোখে পড়ে, তাঁদের বেশ-বাস-আভরণও দেখার মতো—তথৈব দাসীশতম্ অগ্র্যযৌবনং/মহার্হবেশাভরণাম্বরস্রজম্।

বিয়ের সময় থেকে দ্রৌপদীকে লাভ করার সঙ্গে-সঙ্গে পাণ্ডবরা কিন্তু দ্রুপদের কাছ থেকে এই পরমাশ্বাসও লাভ করতে থাকলেন যে. হস্তিনাপুরে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দ্রুপদ তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন। আমরা এই সাহায্যের অর্থ বুঝতে পারি: এই মুহূর্তে এটা কোনও সামরিক সাহায্য নয়, বৈবাহিকতার মাধ্যমে পাণ্ডবরা মিত্রলাভ করেছেন, ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্ট্রং অ্যালাই', সেই 'অ্যালাই' কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক মহলে একটা 'থ্রেট' হিসেবে কাজ করছে। একই সঙ্গে পাণ্ডবদের উপরিপাওনা হল কৃষ্ণ। এই বিবাহ উপলক্ষে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের অন্যান্য বিশিষ্ট উপহারের সঙ্গে যা পাঠিয়েছেন সেগুলো কিন্তু সামরিক উপহার—শিক্ষিত হস্তী, সুশিক্ষিত মদ্রদেশীয় অশ্ব, রথ, কোটি কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা এবং রাশীকৃত মৌলিক স্বর্ণ—বীথীকৃতমমেয়াত্মা প্রাহিণোন্মধুসূদনঃ। এই যে বিশাল রাজনৈতিক এবং সামরিক আয়োজন—এর কেন্দ্রস্থলে কিন্তু দ্রৌপদী। অতএব দ্রৌপদীকে আর সাধারণ এক রাজবধূ হিসেবে বিচার করা যাবে না। এখন থেকেই তাঁকে নিয়ে প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠতে থাকবে। প্রতিপক্ষ রাজনীতির ধারা যে-খাতে বইতে থাকবে, সেখানে দ্রৌপদীও বারবার বিচার্য এবং চিন্তনীয় হয়ে উঠবেন।

জীবনটা তখন ঘোড়ায় জিন দিয়ে চলত না, আর মহাকাব্যের সময়টাও মহাকাব্যিক তালে চলে বলে, পাণ্ডবরাও কোনও তাড়া বোধ করেননি তক্ষুনি হস্তিনাপুরে ফিরে যাওয়ার। ফলত বিয়ের পর বেশ কিছুদিন বাপের বাড়িতে থাকার ফলে দ্রৌপদীও হয়তো খানিকটা নিজেকে স্বাধীনভাবে মেলে ধরতে পেরেছেন স্বামীদের কাছে। মহাভারত-এর কবি অবশ্য এই সময়ে স্বামীদের সঙ্গে দ্রৌপদীকে নিয়ে একটি শব্দও খরচা করেননি, বরঞ্চ শাশুড়ি কুন্তীর কাছে প্রতিদিন পট্টবস্ত্র পরিধান করে নববধূর নম্রতায় প্রণাম করতে যাচ্ছেন দ্রৌপদী, আর কুন্তী তাঁকে পঞ্চপুত্রের উপযুক্তা স্ত্রী হিসেবে অরুন্ধতী, দময়ন্তী, লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করছেন—এই দৃশ্য চোখে পড়ছে আমাদের। আমরা যেন বুঝতে পারছি—কুন্তী অনেক বেশি নিশ্চিন্ত এখন। সেই কোন কালে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে নেমে এসে হস্তিনাপুরে আপন পুত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কুন্তী, যে-কারণে ছেলেদের সঙ্গে রাজনৈতিক দুর্ভোগও ভুগেছেন এ-পর্যন্ত, সেই কুন্তীকে এবার যেন একটু আত্ম-সংবরণ করতে দেখছি। নিজের দায়িত্ব তিনি যেন এখন পঞ্চস্বামীগর্বিতা দ্রৌপদীর স্কন্ধে ন্যস্ত করে মুক্ত হচ্ছেন। অন্তত তাঁর আশীর্বাদের মধ্যে প্রধানতম আশীর্বাদ বুঝি এই যে, কুরুজাঙ্গল দেশে যে-সব রাজ্য ও নগর আছে, সেখানে তুমি ধর্মানুরক্ত চিত্তে নিজের রাজাকে অভিষিক্ত করো—অনুত্তম্ অভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্মবৎসলা। মহাভারত-এর টীকাকাররা সামাজিক দুর্ভাবনাবশতই এখানে ক্রিয়াপদে অনুজ্ঞা-বচনটা যেন একেবারে ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়াল করলেন না এবং বললেন—'অভিষিচ্যস্ব' মানে অভিষেক লাভ করো—অভিষেকং প্রাপ্নুহি। কিন্তু এখানে, ক্রিয়াপদে অনুজ্ঞায় এই শব্দের প্রকৃত অর্থ—কুরুজাঙ্গল দেশে রাজাকে তুমি অভিষিক্ত করো এবার। দ্রৌপদীর বিদগ্ধতা এবং ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিতে কুন্তীর দায়িত্ব-সংক্রমণ মধ্যযুগীয়রা মেনে নিতে পারেননি বলেই মূল মহাভারতীয় শ্লোকের বিকার তৈরি হয়েছে টীকায়, অনুবাদে।

পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ-পর্ব সমাপ্ত হতেই গুপ্তচররা হস্তিনাপুরে এসে দুর্যোধনকে সব কথা জানাল এবং দুর্যোধন তাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগলেন এবং তাঁর ভাইরাও, কর্ণ-শকুনিও—অথ দুর্যোধনো রাজা বিমনা ভ্রাতৃভিঃ সহ। গুপ্তচরের খবর বিদুরের কাছেও গেল, কিন্তু তিনি যখন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে খবরটা জানাতে গেলেন তখন বুঝলেন যে,

আসল খবরটা ধৃতরাষ্ট্র তখনও জানেন না। বিদুরের খুশি দেখে তিনি ভেবে বসলেন—দ্রুপদনন্দিনী তাঁর পুত্র দুর্যোধনকেই পতিত্বে বরণ করেছে—মন্যতে স বৃতং পুত্রং জ্যেষ্ঠং দ্রুপদকন্যয়া—এমনকী তিনি বধূমুখ দর্শনানুভবের জন্য দুর্যোধনকে বহুতর অলংকার-নির্মাণের আদেশ দিয়ে বসলেন। বিদুর এবার ধৃতরাষ্ট্রকে প্রকৃত সত্য জানালেন, এবং এক মুহূর্তের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু দ্রৌপদীর চাইতেও দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের মিলিত হওয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামালেন বেশি। তিনি বলেও ফেললেন—এমন ঐশ্বর্য-সম্পত্তিহীন অবস্থায় দ্রুপদ রাজাকে পাণ্ডবরা যেভাবে মিত্র হিসেবে লাভ করলেন, তার রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে—কো হি দ্রুপদমাসাদ্য মিত্রং ক্ষত্তঃ সবান্ধবম্।

দুর্যোধন-দুঃশাসন এবং কর্ণ-শকুনিরা ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই নানান পরিকল্পনা আরম্ভ করলেন। দ্রুপদ এবং পাণ্ডবদের মধ্যে গুপ্তচর পাঠিয়ে ভেদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম একটা পরিকল্পনা ছিল এইরকম যে, দ্রৌপদীকে পাণ্ডবদের ওপর বিরক্ত করে তোলা হোক। তাতে যুক্তি থাকুক এইরকম—এতগুলো স্বামী নিয়ে তুমি ঘর করবে কী করে? আর পাণ্ডবদেরও প্রত্যেককে বলা হোক—তোমরা পাঁচটা পুরুষ আর এই একটা বউ, তোমরা পরস্পরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করছ! এতে কাজ হবে, তারপর দ্রৌপদীকে আমরাই পাব—টীকাকারের ভাষায়—ততশ্চ তাং



লব্ধ্যামহে ইতি শেষঃ। অথবা এমনও করা যেতে পারে যে, অন্যতরা সুন্দরী রমণীর মাধ্যমে পাঁচ পাণ্ডবকেই প্রলুব্ধ করা হোক এবং তাতেই কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে স্বামীদের থেকে পৃথক করে ফেলা যাবে—একৈকস্তত্র কৌন্তেয়স্ততঃ কৃষ্ণা বিরজ্যতাম্। দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণ-শকুনির মধ্যে এই যে এত সব যুক্তি-তর্ক-পরিকল্পনা চলছিল, সেইসব অনেক কূটনৈতিক যুক্তির মধ্যে একটা বড় প্রসঙ্গ হল—দ্রৌপদীকে পাণ্ডবদের ভালবাসার মোহজাল থেকে মুক্ত করে আনা। এবং অবশেষে নিজেরা দ্রৌপদীর অধিকার লাভ করা। মহাবীর কর্ণ অবশ্য এই পরিকল্পনায় জল দিয়ে দুর্যোধনকে বলেছিলেন—পাণ্ডবদের কোনও ভাইকে তুমি অন্যের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারবে না। কেননা একটা মাত্র বউতে যেখানে পাঁচজনেই আসক্ত, তাদের তুমি পৃথক করবে কী করে? ওদের একতা-বন্ধনের চাবিকাঠিটাই তো ওই একতমা দ্রৌপদী—একস্যাং যে রতাঃ পত্ন্যাং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরম্। আর তোমরা যে ভাবছ—অন্য লোক দিয়ে দ্রৌপদীকে পাণ্ডবদের ওপর বিরক্ত করে তুলবে, সেটা অসম্ভব। কেননা দ্রৌপদী পাণ্ডবদের খুব খারাপ অবস্থা জেনেও সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন, আর এখন তো দ্রুপদ এবং কৃষ্ণের সহায়তায় তাঁদের অবস্থা সমৃদ্ধ হয়েছে, সুতরাং দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের থেকে সরে আসবেন কেন? অতএব এটা অসম্ভব—ন চাপি কৃষ্ণা শকোত তেভ্যো ভেদয়িতুং পরৈঃ।

এরপর কৃষ্ণা দ্রৌপদী সম্বন্ধে কর্ণ একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, যা আজকের দিনের প্রগতিশীল যৌক্তিকতায় অবশ্যই বিচার্য হওয়া উচিত এবং আমার সহৃদয় পাঠককুল এবং ততোধিক সহৃদয়া পাঠিকা-রমণীরা যেন এই আলোচনাকে যুক্তিবাদিতার দৃষ্টিতেই ক্ষমা করেন। পাণ্ডব-ভাইদের ওপর বিরক্তি তৈরি করে দ্রৌপদীকে যে ভাঙিয়ে আনা যাবে না, সে-বিষয়ে কারণটা, কর্ণের মতে, দ্রৌপদী নিজেই। কর্ণ বলেছেন—দ্যাখো, মেয়েদের যদি একের চেয়ে বেশি স্বামী থাকে, তবে সেই বহুভর্তৃকতা মেয়েদের কাছে যথেষ্টই কাম্য অর্থাৎ পছন্দের—ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণামেকস্যা বহুভর্তৃতা। দ্রৌপদী এটাই পেয়েছেন, পাঁচ-পাঁচজন উপভোক্তা বা উপভোগক্ষম পুরুষকে

বহুপুরুষগামিতার চিত্রটা যে আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল মনে হয়, তার কারণটা কখনওই অন্তঃস্থিত কোনও বৃত্তি নয়, হাজার-হাজার বছর ধরে তাকে সামাজিকতার সংস্কারে এইভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে বলেই বহু পুরুষগামিতার ক্ষেত্রে মেয়েরা তেমন উন্মুখীন হয়ে উঠতে পারে না সহজে।

আমরা এই নিরিখে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী-লাভের ঘটনাটাকে সমাজ-স্বীকৃত সুব্যবস্থা বলেই ধরে নেব। তার মধ্যে দ্রৌপদীর শারীরিক আকর্ষণ সম্বন্ধে যত কথা মহাভারত-এ আছে, তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে oestradiol level-টা তাঁর মধ্যে উচ্চতার জায়গায় ছিল কি না বলতে পারব না—কেননা তাতেই নাকি মেয়েদের যৌন-আকর্ষণ বেশি হয়—কিন্তু তিনি পঞ্চস্বামী-গ্রহণের উপযুক্ত আধার ছিলেন, সে-কথা বারেবারেই প্রমাণিত হবে। বিশেষত হৃদয়গত আবেগ-মধুরতায় কোন স্বামীকে কী এবং কতটা দিতে হবে, সেটা দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণীকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ব্যাপারটা কবির দৃষ্টিতে অদ্ভুত নিপুণতায় দেখিয়েছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। উল্লেখ্য, কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচীর অনুরোধে কবিতা লিখতে গিয়ে অন্য কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দ্রৌপদী সম্বন্ধে লিখেছেন—

বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
    দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
    মধ্যমা দিলে পার্থ বীরে;
ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা,
    ধরিল নকুল হৃষ্টমনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
    সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে।

কবির লেখনীতে আপ্তবাক্যের মতো যে-শব্দ উচ্চারিত হয়, তার মধ্যে যে কত গভীর সত্য থাকে, তা বোধহয় তিনি নিজেও অনুধাবন করতে পারেন না। অঙ্গুষ্ঠ বা বুড়ো আঙুল বস্তুটা বৃহত্ত্ব মহত্ত্বের প্রতীক বটে, তবে বুড়ো আঙুলের মধ্যে একটা সুমহান অনর্থকতাও আছে, যেখানে যুধিষ্ঠির খুব গুরুত্বপূর্ণ ঔপাধিক হওয়া

'মধ্যম' শব্দটার মানেই একটু উদাসীন, নিরপেক্ষ ভাবের মানুষ; দ্রৌপদীর জীবনে অর্জুনের ভূমিকার মধ্যে কখনওই খুব আঁকড়ে ধরা নেই, অথচ মধ্যমাঙ্গুলির মতো সবচেয়ে বড়ই তো অর্জুন, দ্রৌপদী তাঁকেই জীবনের মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন।

যদি কেউ শাস্ত্রসম্মতভাবে স্বামী হিসেবেই পায়, তা হলে দ্রৌপদীর মতো একজন রমণী তাঁদের ছেড়ে থাকবেন কেন? অতএব দ্রৌপদীকে স্বামীদের থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আসাটা প্রায় অসম্ভব—তচ্চ প্রাপ্তবতী কৃষ্ণা ন সা ভেদয়িতুং ক্ষমা।

কর্ণের কথাটা যদি তাঁর অভিমান-শ্লেষ থেকে বিশ্লিষ্ট করে একটু তটস্থ হয়ে বিচার করা যায়, তবে আজকের দিনের গবেষণায় এই মন্তব্যের কিছু সত্যতাও খুঁজে পাওয়া যাবে। পণ্ডিতজনরা এ-বিষয়ে দু'টি অসাধারণ শব্দ খুঁজে বার করেছেন—একটি হল exclusivists অর্থাৎ পুরুষ-পরিহারিণী গোত্রের, অন্যটি varietists অর্থাৎ পুরুষ-বৈচিত্র্যবাদিনী। ওঁরা বলছেন—এমনকী মহামতি কিন্‌স-এর মতও তাই—যে, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেই বৈচিত্র্য পছন্দ করে, একই জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সাবেগে যৌন-জীবন কাটিয়ে যাওয়া কোনও রমণীর অন্তর্গত প্রয়োজনের জায়গা নয়, এটা সংস্কৃতিগতভাবে তার ওপর চাপানো একটা সামাজিক শৃঙ্খলা। এমন একটা দায়বদ্ধতা যদি হাজার-হাজার বছর ধরে রমণীর মনের মধ্যে অন্তর্জাত কোনও সংস্কার তৈরি না-করত, তা হলে মেয়েরাও পুরুষের ব্যাপারে বৈচিত্র্যবাদী হত, যেমনটি পুরুষরা মেয়েদের ব্যাপারে হয়। স্বয়ং কিন্‌স-এর মতও তাই। তিনি অনেক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, মেয়েদের মধ্যে

সত্ত্বেও দ্রৌপদীর জীবন এবং হৃদয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই অকিঞ্চিৎকর। আবার দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনই বোধহয় দ্রৌপদীর একমাত্র স্বামী, যাঁর মাধ্যমে তিনি আপন নিন্দিত শত্রুদের দমন করতে পেরেছেন, সেখানে তাঁর তর্জনী ধারণ করাটা যথেষ্টই ব্যঞ্জনাময়। আবার অর্জুন-রূপী মধ্যমাটা দেখুন। 'মধ্যম' শব্দটার মানেই একটু উদাসীন, নিরপেক্ষ ভাবের মানুষ; দ্রৌপদীর জীবনে অর্জুনের ভূমিকার মধ্যে কখনওই খুব আঁকড়ে ধরা নেই অথচ মধ্যমাঙ্গুলির মতো সবচেয়ে বড়ই তো অর্জুন, দ্রৌপদী তাঁকেই তো জীবনের একমাত্র মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন। এত সরল একটা পদ্যে তিন কুন্তীপুত্র থেকে মাদ্রীপুত্রদের পৃথক করলেন যতীন্দ্রনাথ, আমি ভেবে অবাক হই। নকুল-সহদেবের কথা যেই এল, অমনি 'ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা'—অর্থাৎ দ্রৌপদীর মতো বিদগ্ধা রমণীকে ধরারই ক্ষমতা নেই নকুল-সহদেবের, যদি না তিনি আঙুল ধরার ইঙ্গিতটুকু না দেন। তার মধ্যে সহদেবের চেয়েও নকুল দ্রৌপদীর কাছে আরও অনামিক, সেই জন্য তাঁর জন্য অনামিকা। আর সহদেব দ্রৌপদীকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে সত্যিই কতটা ধন্যম্মন্য, সময়ে তার পরিচয় দেব।

অলংকরণ : শান্তনু দে

(চলবে)

অমিতাভ মালাকার

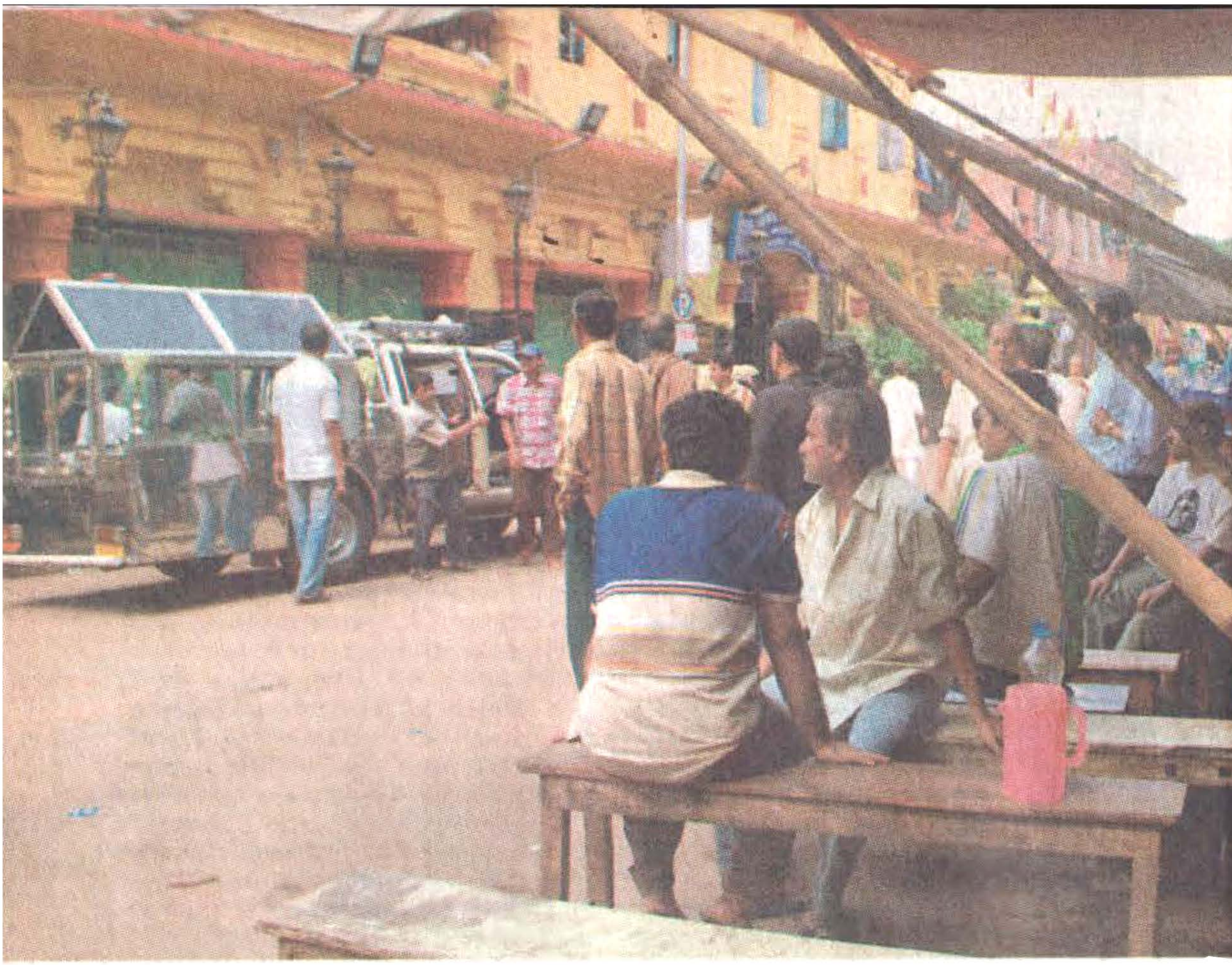
শহরের বার্নিং-ঘাটগুলোর চারপাশে হাজার হাজার খাবারের দোকান। জ্যাঠামশাইয়ের বডি তেরো নম্বরে মানেই উল্টোদিকে পাঁচু ঘোষের দোকানে ঢুকে ডালপুরি, দানাদার, দু'টো করে পান্তুয়া, ন্যাতানো জিলিপি...



বেশ কিছুকাল আগে একবার শান্তিনিকেতনে রাহুল বসুর বাড়িতে আছি, বিকেলের দিকে আকাশ বাতাস কাবাবের গন্ধে ম-ম করতে লাগল। রাহুলদা-রা সকলেই ভেজিটেরিয়ান এবং বাড়িতে একটা ভেজিটেবিল রেস্তোরাঁও চালাচ্ছেন সে সময়। মূল ইউনিভার্সিটি চত্বর ছাড়িয়ে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে আলুভাজা, টমেটোর স্যুপ, পটেটো ইন জ্যাকেটস, ব্রোকোলির কী একটা, বেগুনের ইতালিয়ান না স্প্যানিশ কীসব হচ্ছে সারাদিন। আমি সকাল থেকে ভেজিটেরিয়ান হওয়ার গুণাবলি, হিমালয়ে বছরের পর বছর কেমন গাছের ছাল, ঝরনার জল আর মধু খেয়ে সাধুদের অত্যাশ্চর্য সাধনার ম্যাগনেটিক ইকুইলিব্রিয়াম, মাছ মাংস খেয়ে শরীরে টক্সিসিটি বাড়ানোর বিপদ, রমেনের গলায় ছেলেবেলায় মাছের কাঁটা আটকে কেমন বিপদ হয়েছিল ইত্যাদি ভেবে শরীর এবং মনে বল আনার চেষ্টা করছি আর বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা গুনগুন করছি, এমন সময় এহেন আপদ। কাবাবের এসেন্স মেখে যত্ত ফেনকণা নাকের ডগায় নাচতে লেগেছে। আমি একদৌড়ে ঘরে ঢুকে রাহুলদাকে জাপটে ধরলাম। এখানে কাবাবের গন্ধ এল কোত্থেকে বলতেই হবে। রাহুলদা আমার দিকে অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে কান ধরে বাইরে বের করে চাপচাপ অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, ওইখান থেকে তোর কাবাবের গন্ধ আসছে। ওটা শ্মশান। নদীর ধারে। বিকেলের দিকে রোজই দু'চারটে বডি নামে। পিওর সোনাঝুরির কাঠে জ্বালানো হয়। যাকে বলে ধক করে নিভে গেল বুক ভরা আশা। কোথায় ভেবেছিলাম সারাদিন পিওর অ্যান্ড সিম্পল ক্লোরোফিল ইনটেক করার পর গন্ধে গন্ধে 'আর কতদূর বলো মা' গাইতে গাইতে গুটিগুটি দু'চার পা এগিয়ে গিয়ে দেখব হেলো-ক্যাম্বনো একগাল আবক্ষ দাড়ি সমেত হাসি হাসি মুখ সাদা ধপধপে পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত আমাদের মজিদ স্যারের মতোই কেউ কাবাব-বিরিয়ানির দোকান খুলে বসে আছেন খদ্দেরের আশায়, তার বদলে মড়া পোড়া? এমন দুঃখ সারাজীবনে আর পাইনি।

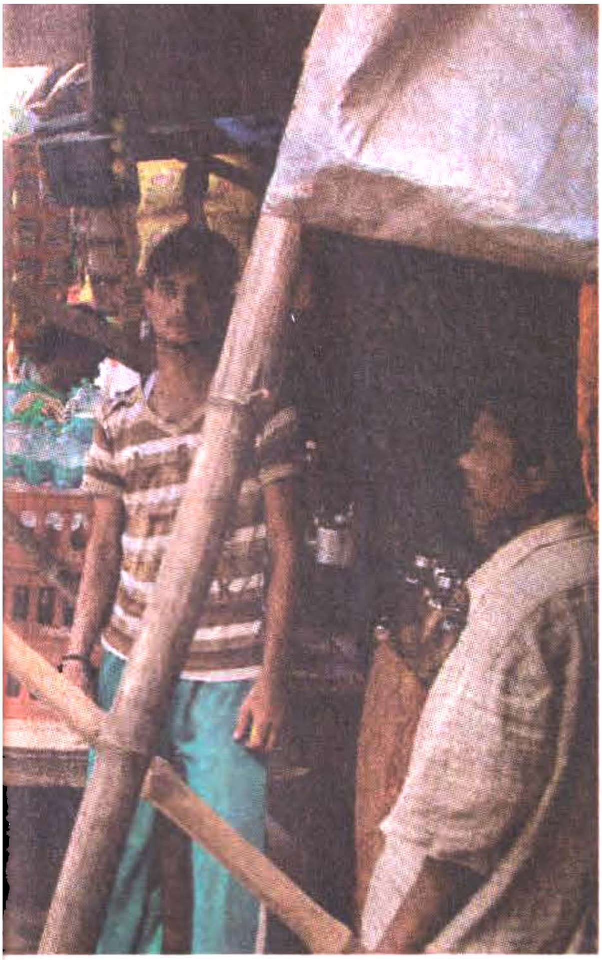
যাই হোক, আমার পরে আশ্চর্য লেগেছিল এই ভেবে যে শ্মশানের ওই চামসা টাইপের প্রাইটলি মহাপ্রাণী খাইসে আসা সুখাভাসটিকে চিনতে না পারাটা আমার পক্ষে সেনসিবিলিটি সেট করার লক্ষণবিশেষ। আমাদের সময়ে কলেজে পড়াকালীন গ্রীষ্মের মন্দ মন্থর সন্ধ্যাগুলো কাটানোর ডেডিকেটেড ইনটেলেকচুয়াল অপরচুনিটি যে ছিল না তা নয়, সে অপরচুনিটি গ্রহণও করেছি দর্শকাসন থেকে, তবে সেদিনের এক্সাসাইজের জন্য নানাবিধ উপায় শহরের নীচেরতলাগুলোতে নিরন্তর মজুত হতে দেখে যে প্রকার চমৎকৃত হয়েছিলাম, তার ঘোর থেকে আজও পুরোপুরি মুক্তি পাইনি। আর একেবারে গরু না হলে কেই বা মুক্তি চায়? তবে সে অন্য প্রসঙ্গ, এখন থাক সে সব কথা। আমার নারায়ণ ভূতের ভয় থাকা সত্ত্বেও—ভগবান-টগবান দূর বাজে কথা, তবে ভূত আছেই, আজকাল তো ভিড়বাসেও মাঝেমধ্যে নাক টেনে মনে হয় গন্ধটা খুব সন্দেহজনক—চার ইয়ারে মিলে বহু রাত কাটিয়েছি এ শহরের এবং শহরতলির শ্মশানগুলোয়। যাঁদের শ্মশানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁরা হয়তো খেয়াল করে থাকবেন যে শহরের বার্নিং-ঘাটগুলোর চারপাশে হাজার হাজার খাবারের দোকান। জ্যাঠামশাইয়ের বডি তেরো নম্বরে মানেই উল্টোদিকে পাঁচু ঘোষের দোকানে ঢুকে ডালপুরি, দানাদার, দু'টো করে পান্তুয়া, ন্যাতানো জিলিপি, নেপোয়ানের সিরা দিয়ে বাসি সিঙাড়া, ঢাকাই পরোটা আর মাখা মাখা আলুর দম—সঙ্গে লাল ঝাল ডিম কষা, ডবল ডিমের মামলেট—প্রণবের বাপ মরেছে আর আমরা তিন মাইল বডি বয়েছি, তাই সেকালে ওই খাওয়াচ্ছে, সেকেন্ডে ডবল ডিমই খাই, আর শেষে চা। জ্যাঠার বডি তেরো থেকে পাঁচে যাওয়া মানেই বেহালার ছেলেদের সঙ্গে লাইনের গন্ডগোল নিয়ে একপ্রস্থ হাতাহাতি আর তারপর ফের এক রাউন্ড চা, শিবনের হন্তদন্ত হয়ে গাঁজা নিয়ে প্রবেশ এবং কানাইয়ের একটানা খোলা গলায় খ্যানখ্যানানি—তখনই বলেছিলাম জলের জায়গাটা নিয়ে চল, তোরা শুনলি না, এখন কীসে রাখবটা সোনাদি, আমি খামসাপ ছাড়া রাম খেতে পারি না। সবাই জানে গাঁজা খেলে ভয়ানক খিদে পায়, তাই ওপারে ছুটে গিয়ে কেউ আরও গোটা দশ বারো ডিমের কালিয়া নিয়ে এল। সঙ্গে কুচো পেঁয়াজ ছড়ানো ভাই ঘুগনি শালপাতা ঢাকা দেওয়া। একমুঠো কাঁচালঙ্কা আর লেবু ছাড়া খপন আজ অবধি কোনওদিন কোনও শ্মশানে যায়নি, তাই ও নিয়ে চিন্তা নেই। ওর বুকপকেটে এমনিতেই কাগজে মোড়ানো বিট-লবণ থাকে। চুল্লায় বডি ঢুকে থাকে। নড়ার উপায় নেই বলে বডি ঢাকা দেওয়া চাদরের তলায় কোল্ডড্রিংকসের বোতলে মেশানো রাম—একবার সবসুদ্ধ চুল্লিতে ঢুকে গিয়েছিল বলে এবার বোতলের মুখ সুতলি দিয়ে নিজের কড়ে আঙুলের সঙ্গে বাঁধ—নিজেরটা নিজে বুঝে নিয়েছে। কমল মাঝেমাঝে সবার অলক্ষে ওর মুখে ডিম কষা আর ঘুগনি দিয়ে আসছে। একবার আপত্তি করেছিল অশৌচ না কী সব আছে বলে। তারপর বড় জেঠিমা শ্মশানেই খিড়কির পুকুরটা প্রোমোটারকে দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলায় দেখলাম রাতে হরিদেবের দোকানে চিকেন চাউমিন খেয়ে তবে বাড়ি ফিরবে বলল।

শ্মশানে আমরা যেতাম মূলত চা খেতে। সারারাত ছবি আঁকার কাজ করেছি মিস্ত্রিদের সঙ্গে। কেউ



দেয়ালে ক্যানভাস মেরেছে, কেউ প্রাইমার লাগিয়েছে একধারসে টানা—ভোররাতে সবার কাজ শেষ হলে পর হিসেব বুঝে নিয়ে বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরবে কেউ তো কারও হাঁটাপথ পঞ্চাননতলার বস্তিতে—সবাই মিলে কেওড়াতলা অবধি হেঁটে চা খেয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আমার এক বন্ধু বেতের ঝুড়ির ওপর নানারকমের নকশা এঁকে বিদেশিদের কাছে বেচত। ওর সঙ্গে থেকে ওই কাজ শেখার চেষ্টা করেছিলাম কিছুদিন। কোন বাঁশ অসমের, কোন বাঁশ বিহার বা উত্তরবঙ্গ থেকে আসে সে নিয়ে বকবক করত খুব আর বড়বাজারের এ গলি সে গলি দিয়ে হেঁটে বেড়াত আমায় প্রায় বগলদাবা করে ঝুড়ির খোঁজে। নিমতলা সে সময় এমন সাজানো-গোছানো ছিল না। মেলা লোক সারা দিন-রাত ভিড় করে থাকত। মাল বোঝাই লরি, ম্যাটাডোর ভ্যান, এমনি সাইকেল ভ্যান আর ঠেলায় জমজমাট রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটতাম আমরা আর ও কেবলই ঝুড়ির ওপর কোন প্রাইমার মারলে কেমন তার এফেক্ট, কোন ঝুড়িতে রং না দিয়ে সুতোর কাজ করাবে বলে ভাবছে বা নানা ধরনের কঞ্চির মাপ সম্পর্কে নিজের মনে কথা বলে চলত। আমার ঝুড়িতে রং করার কায়দা শেখা হয়নি, তবে গঙ্গার ধারে বসে সারারাত ছিটগ্রস্ত একজনের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বাঁশ এবং ঝুড়ির ডিম্যান্ডের ওঠা-পড়া এবং তার পলিটিকাল ইমপ্যাক্ট অন ইন্ডিয়ান ইকনমি নিয়ে গম্ভীর আলোচনা চালাতে মন্দ লাগত না।

পরিতোষদাকে ওই অঞ্চলে চেনে না এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। প্রথমত উনি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে অন্য চা-ওলাদের মতো চা লাগবে কি না জিজ্ঞাসা করার ধার ধারেন না। খুরিতে চা ঢেলে আপনার হাতে ধরিয়ে চলে যাবেন এবং ঘণ্টাখানেক পরে দ্বিতীয় কাপ চা ঢেলে সামনে ধরে তারপর পরে কা কথা। আর একটা কারণে লোকে পরিতোষদাকে চেনে। পঞ্চাশোত্তীর্ণ শীর্ণকায় খাকি হাফপ্যান্ট আর ট্রাম কোম্পানির জামা গায়ে এই লোকটি পৃথিবীর যাবতীয় অদ্ভুত আর বিটকেল মার্কা সব খবর রাখতেন এবং শ্মশান-যাত্রীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে চা দেওয়ার ফাঁকে আলাপ জমিয়ে সে সব তথ্য পরিবেশন করতেন। সদ্য পিতৃবিয়োগে উদ্‌ভ্রান্ত বা মাতৃবিয়োগের ফলে চরম বিষাদগ্রস্ত সন্তান-সন্ততিদের ওয়াচ করতেন দূর থেকে। কেউ একটু দম নেওয়ার জন্য ক্রন্দনরত আত্মীয়দের জটলা ছেড়ে বেরিয়েছে কি বেরয়নি, অমনি উনি হাসি-হাসি মুখে সামনে এক কাপ চা ধরে 'খেয়ে নিন, সব জ্বালা যন্ত্রণা চলে যাবে' বলে শুরু করতেন। নির্জন পথিমধ্যে প্রেতিনীরা বিদেশি পথিককে একলা পাইয়া যেরূপ মায়াবিনী কুহকিনী সাজিয়া এই করিতে দিব সেই করিতে দিব বলিয়া ভুলাইয়া নিজ বাটীতে লইয়া যায় এবং তাহার পর আহ্লাদ করিয়া সরবত খাওয়াইয়া তদপশ্চাৎ ঘাড় মটকাইয়া রক্ত পান করিয়া থাকে, পরিতোষদাও সেইরূপ 'আহা বাপ মরেছে বুঝি', 'ও, তুমি বুঝি তৃতীয় পক্ষের তাই তোমাকে দিয়ে মাদুর কেনাল' বা 'ট্রেনে কাটা গিয়েছে বলছ, আমি তো ভাবলাম ডবল ডেকারের তলায় পড়েছিল, যেরকম থেঁতলে গিয়েছে' ইত্যাদি নানারকম সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া চা খাওয়াইয়া তারপর আস্তে আস্তে খাপ খুলতে থাকে। জ্ঞান ফিরলে পর—যদি আদৌ ফেরে—শ্মশানযাত্রীটি দেখেন বাকিরা কেউ কোথাও নেই, সব বডি পোড়ানো শেষ, সামনে ছাপাখানার লোক শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নের কার্ডের সেকেন্ড প্রুফ নিয়ে মিহি গলায় বলছে 'স্যার, ফাদারের নামের বানানটা একটু দেখে দিন, না হলে কালকের মধ্যে ডেলিভারি দিতে পারব না।' আর হ্যাঁ, পরিতোষদা আছেন। উনি সেই একইরকম হাসি-হাসি মুখে সামনে চায়ের কাপ ধরে বলছেন, 'তারপর গয়ায় পিণ্ডি দিতে গিয়ে সেবার যা হল, সে আর কী বলব।' তবে আমি অন্তত কোনওদিন এমন দেখিনি যে নিমতলায়



পরিতোষদা নেই রাত বারোটা হোক, তিনটে হোক, সকাল দশটা বা বিকেল চারটে, পরিতোষদা সবসময় উপস্থিত, লোকটা কখন ঘুমোয়, কখন খায়, কোথায় থাকে কে জানে। ও, আর একটা গল্প না বললেই নয়, পরিতোষদা যে গল্পটা করতে সবচাইতে ভালবাসতেন তা হল, উনি নাকি একবার পাটনার রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন, এমন সময় পায়ের কাছে দড়াম করে কী একটা পড়ল। উনি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখেন হাতল মতো কী একটা। হাতে তুলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, হঠাৎ এক বিশালাকায় জটাজুটোধারী সন্নিসিকাব ইয়া বড় বড় কটকটে লাল চোখ মেলে কোত্থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে উঠলেন 'স্কাইল্যাব, স্কাইল্যাব'। পরিতোষদা আর দাঁড়ালেন না। ধাঁ করে সন্নিসিঠাকুরকে একটা পেন্নাম ঠুকে একদৌড়ে স্টেশনে এসে পুবমুখে একটা গাড়িতে চেপে সোজা কলকাতা। পকেটে বড়মামিমার বালাজোড়া ছিল স্যাকরাকে দিয়ে ভাঙিয়ে ফুলির হার, কানপাশা, ছ'গাছা চুড়ি আর বরের আংটি গড়াবার জন্য। কলকাতায় এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই দিয়ে চায়ের কারবার শুরু। এতদ্‌সত্ত্বেও ফুলির বিয়ে ঠিকই হয়েছিল। জামাইটিও বেশ ভাল। গোটা সাত-আষ্টেক ছানাপোনা সমেত কলকাতায় এসে পরিতোষদার হাত ধরে সে কী কান্না—'তুমি আর গেলে না, মা মরার আগেও তোমার নামই করেছে কেবল।' সে যাক।

ওই 'স্কাইল্যাবের ভাঙা টুকরো' আমরা অনেকেই দেখেছি। ট্রামের ড্রাইভাররা যে জিনিসটি ঘটাং ঘটাং শব্দে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে ট্রাম চালিয়ে থাকেন। এবং যে জিনিসটিতে একবার হাত দেওয়ার ও নাড়ানোর ইচ্ছে আমার সারাজীবন থেকেই যাবে, ওটা অবিকল সেই জিনিস। এমনকী পেতলের গুল্টি মার্কা ধরার জায়গাটাও এক। পরিতোষদাকে সে কথা বলা হয়নি তা নয়। উত্তরে তিনি স্মিত হেসে কোনওদিকে না চেয়ে আপনমনে চা ঢেলে হাতে-হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। আমার সবসময়ই মনে হয়েছে, শুধু কলকাতার কেন, সব জায়গাতেই রাস্তার খাবারের সঙ্গে বিশেষ ধরনের গল্পের এবং গল্প বলার কায়দা জড়িয়েমড়িয়ে একাকার হয়ে থাকে। শ্মশান, হাসপাতালচত্বর, থানা ইত্যাদি জায়গা, যেখানে মানুষ দায়ে না পড়লে যায় না, সেখানকার মানুষদের বা তাদের গল্পের শেষ কোথায় তার একটা আনুমানিক হিসেব হয়তো তবু পাওয়া গেলেও যেতে পারে, তবে শুরু বা বীজ খোঁজার চেষ্টা না করাই ভাল। করতে হলে ভায়া নিজের জীবনটাকে ওই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। ওইখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলার, ভাব করার ক্ষমতা না থাকলে বা তাদের আহ্লাদের অংশীদার না হতে পারলে সে গল্পের সম্পূর্ণ রসাস্বাদনও কতটা সম্ভব সে নিয়েও আমার সন্দেহ আছে। এই শহরে কয়েক লক্ষ চা বিক্রেতার প্রত্যেকের বেচার আলাদা কায়দা আছে। কেউ গম্ভীর, কেউ খাতির করেন অন্যদের তুলনায় বেশি, কাউকে দেখলে মনে হয় নবাব খাপ্পা খাঁ-র ডাইরেক্ট নাতি তো কেউ কেটলি নামিয়ে রেখে সেই যে মাথার তলে গামছাখানা পাকিয়ে চোখ বুঁজে শুলেন তো শুলেনই—চা হবে না মানে কোনওভাবেই হবে না। প্রভুর ঘুম ভাঙানোর প্রশ্নই আসে না। আবার এক একজনকে ঘিরে আড্ডা জমে ওঠে।

পরিতোষদা যেমন গঙ্গার ঘাটে কখন কোথায় থাকবেন সেটা একদম ফিক্সড। কোথাও বিকেল সাড়ে চারটেয় একবার, পাঁচটায় এবার আর সোয়া পাঁচটায় আর একবার চা দিতে হবে। হবেই। তার ওপর অনেক মানুষের সেদিন বিকেল সন্ধ্যার মুড কেমন থাকবে, তা নির্ভর করে। আপিস-টাইমে হাওড়ার দিক থেকে লঞ্চ ঘাটে এসে ভিড়লে দেখবেন পরিতোষদা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর বারো মাসের বাঁধা খদ্দেররা আসবেন, আর তারপর একঢোক চা খেয়ে বাস ধরে বাড়ি। অন্য চা-ওলাদের তুলনায়—এই যাদের বেঞ্চিপাতা চায়ের দোকান আছে সেরকম—পরিতোষদাকে ছুটতে হয় বেশি, তবে একদিন বলছিলেন যে যেদিন এই ছোটা বন্ধ হবে সেদিন নিমতলার আশপাশের এ অঞ্চলে তোমাদের পরিতোষদারে আর দেখতে পাবা না। হয়তো পরিতোষদা না আসলে বেণুরাও আসবে না আর। বেণু নিজে চাঁছা গলায় 'এই মেটে চাই মেটে, তাজা পোড়া লাল মেটে, বাচ্চা বুড়ো মেটে লাগবে' বলে এইসা চিৎকার করে ওঠে যে রাতের বেলায় দুর্বলহৃদয় মানুষের হার্টফেল হয়ে যেতে পারে। তার ওপর সার সার বড়ি শোয়ানো, সেখানে তাজা লাল পোড়া মেটের জন্য হাঁকাহাঁকি শুনে অনেককেই সন্দেহ ভরা চোখে এদিক-ওদিক চাইতে দেখেছি। আসলে বেণুর কারবার মেটে হাঁড়ির। নানা সাইজে পাওয়া যায় বলে ওইরকম বীভৎস হকারির স্টাইল। কী জানি, এগুলোকে বাদ দিয়ে মনে হয় না কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে ওখানে কারবার চালাতে পারবে—অবশ্য সুস্থতা কেমন জিনিস সে নিয়ে আপনাদের নিজেদের মতামত তো থাকবেই। চারদিকে এত শোক, তার মধ্যে এই লোকগুলো চা খাইয়ে, উদ্ভট গল্প বলে, রসিকতা করে কোনওক্রমে হয়তো বিগড়ে যাওয়া মাথাগুলোকে সামান্য পরিমাণে হলেও শান্ত রাখতে সাহায্য করে—আমি এইরকম সুস্থতার কথা বলছিলাম আর কী। একটা সময়ে এই দলটার সঙ্গে আমাদের খাতির জমেছিল খুব। কবে পুলিশের লোক এসে কাদের কাদের তুলে নিয়ে যাবে, কখন কোথায় আমাদের যাওয়া উচিত হবে না বা কাদের মড়া এলে ঝামেলা লাগাতে পারে, সে সম্বন্ধে ওরা খোঁজ রাখত নিজেদের বাঁচাবার জন্য। আমরাও সেই সংবাদ আগেভাগে পেয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। যদি পারেন তা হলে একদিন গিয়ে পরিতোষদার চা খেয়ে আসবেন। চিনতে অসুবিধে হলে এমনিই ঘুরঘুর করবেন খানিকক্ষণ, উনি নিজেই আসবেন আপনার কাছে। হয়তো স্কাইল্যাবের ভেঙে পড়া যন্ত্রাংশ দেখার সুযোগও ঘটতে পারে ভাগ্য ভাল থাকলে।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

 রূপক সাহা

ক্ষমা করো হে প্রভু

চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় ভূমিকম্পের মধ্যে পড়ে গোরা এবং অন্যান্যরা। ফলে পুরী পৌঁছতে দেরি হয়। এদিকে হঠাৎই প্রবল জ্বরে জ্ঞান হারায় গোরা।



ছিয়াশি

গায়ে বেশ জ্বর। চোখ খুলতে পারছিল না গোরা—চোখের পাতা এমন ভারী হয়ে গিয়েছে। উপুড় হয়ে ও শুয়েছিল। হঠাৎ যেন কার গলা শুনতে পেল, 'প্রভু, জয়দেব এসেছে।'

জয়দেবের নাম শুনে গোরা চোখ খুলে উঠে বসল। অনেকদিন জয়দেবের সঙ্গে দেখা হয়নি। উপাসনার মৃত্যুর খবর ও অবধূতজির মুখে শুনেছে। তারপর থেকেই জয়দেবের জন্য মনটা উতলা হয়ে রয়েছে। ওর বিয়েতে কলকাতায় যাওয়ার জন্য গোরা মনে মনে প্রস্তুত ছিল। চোখ খুলে গোরা যাকে দেখল, সে জয়দেব বলে ওর মন বিশ্বাস করতে চাইল না। চোখের কোণে কালি, একগাল গোঁফ-দাড়ি, গায়ের রং কালো হয়ে গিয়েছে। একদম ভেঙে পড়া একটা মানুষ। নিজের শারীরিক অশক্তির কথা ভুলে গোরা বলে উঠল, 'এ কী, তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না জয়দেব।'

'তোমার শরণ নেওয়ার জন্যই এলাম গোরা। অবধূতজিই বললেন, তোমার কাছে আসতে।'

'এসো এসো, আমার কাছে বসো। কেমন আছেন অবধূতজি? পুরীতে এখন আছেন?'

'না। উনি পানিহাবার কাছে গিয়েছেন।' বলেই একটু অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে তাকাল জয়দেব। তারপর বলল, 'মা চিন্ময়ীর আশ্রমে যা হয়েছে, তার কী তুমি কিছুই শোনোনি?'

গোরাও অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'না। আমি কয়েকদিন এখানে ছিলাম না। কী হয়েছে ওখানে?'

'ডাকাত, খুন। কাগজে তো খুব লেখালিখি হয়েছিল এ নিয়ে। অবধূতজি সেই সময় আশ্রমে ছিলেন না বলে বেঁচে গিয়েছেন। একদল লোক রাতের অন্ধকারে তাণ্ডব চালিয়ে গিয়েছে আশ্রমে। দু'জন আশ্রমিক খুন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন অবধূতজির নিকট আত্মীয়।'

কথাগুলো শুনে গুম হয়ে রইল গোরা। এ নিশ্চয়ই হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের লোকদের কাজ। চিফ মিনিস্টারের অনুরোধ ওঁরা রাখলেন না। তার মানে, গোবিন্দ সাহুর দল এখন আরও উগ্র হয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ পট্টনায়েক-কে ওঁরা আর মানছেন না। পরিস্থিতি বুঝতে পেরেই অবধূতজি চলে গিয়েছেন পানিহাবার কাছে। গোরা জিগ্যেস করল, 'অবধূতজি কি আর ফিরে আসবেন না?'

জয়দেব বলল, 'মনে হয়, না। আমার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছে পরশুদিন বিকালে কেওনঝড়গড়ের ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে। তখনই উনি বললেন, মা চিন্ময়ীর আশ্রমে আর ফিরবেন না। কেওনঝড়গড়ে ওঁদের কী যেন এক মহাসম্মেলন আছে। সারা ভারত থেকে উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক কিছু মানুষ জড়ো হয়েছেন। সেখানে উনি ব্যস্ত থাকবেন। কলকাতা থেকে আমি পুরীতে এসেছিলাম, ওঁর কাছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। উল্টে, উনিই আমাকে মা চিন্ময়ী আশ্রমের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমার মনের যা অবস্থা, তাতে অত বড় দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব না। সেটা শোনার পর উনি আমাকে তোমার কাছে আসতে বললেন।'

'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তুমি কেওনঝড়গড় গিয়েছিলে কেন?'

'একটা ছবির খোঁজে। আত্মানন্দ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি আত্মানন্দকে চিনলে কী করে?'

'পুষ্পেন্দুদা মারফত। আত্মানন্দের মুখেই শুনলাম, তোমার প্রাণহানির জন্য একদল লোক উঠে-পড়ে লেগেছে। গোরা তুমি সাবধান। পাঁচশো বছর আগে মহাপ্রভুর অদৃষ্টে যা ঘটেছিল, সেটা তোমারও কপালে লেখা আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।'

কথাটা উপেক্ষা করল গোরা। প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য বলল, 'তোমার রিসার্চ কি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে জয়দেব?'

'মনে হয়। আমি জানিস দেবদোসের আঁকা শেষ অর্থাৎ তৃতীয় ছবিটা হাতে পেয়ে গিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই জানো, রিসার্চ শেষ করার জন্য এতদিন এই ছবিটার অপেক্ষাতেই আমি ছিলাম। কিন্তু হদিশ পাচ্ছিলাম না। কথায়-কথায় আমি আত্মানন্দকে এই ছবিটার কথা বলি। সত্যি লোকটার ক্ষমতা আছে বটে: ও একটা দুঃসাধ্য কাজ করেছে। কেওনঝড়গড়ের জঙ্গলের মধ্যে এক গোপন মন্দির থেকে ও ছবিটা উদ্ধার করে এনেছে। আমাকেও ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধান নিয়ে রহস্যের

সম্ভবত সমাধান হয়ে গেল। এই জামিল ফেরদৌসই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা ছিনটে ছবি এঁকে সবাইকে জানানোর চেষ্টা করেন। অন্তিম মুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল, এতদিনে আমরা তা জানতে পারলাম। ছবিগুলোর কথা প্রথম জানতে পারেন সুশোভনদা। কী দুর্ভাগ্য দ্যাখো ওঁর। ছবিটার জন্য বেঘোরে প্রাণ দিলেন। অথচ দেখে যেতে পারলেন না।'

এইসব কথা জয়দেবের মুখে আগে শুনেছে গোরা। ওর কৌতূহল হল ছবিটা সম্পর্কে। ও জিগ্যেস করল, 'ছবিটা কি তোমার সঙ্গে আছে?'

'আছে। দাঁড়াও, ঘরের দরজাটা আগে বন্ধ করে দিয়ে আসি। আমি চাই না, কেউ দেখে ফেলুক।'

কথাগুলো বলে উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এল জয়দেব। তারপর কাঁধের ঝোলা থেকে গোল করে পাকানো একটা কাগজ বের করে আনল। সেটা খুলে চোখের সামনে মেলে বলল, 'এটা অবশ্য আসল ছবি নয়, জেরক্স কপি। আসল ছবিটা আত্মানন্দর কাছে রয়েছে। সেটা ও ক্যুরিয়র করে লস অ্যাঞ্জেলসে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ছবিতে জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। বাইশি পাহাচ দিয়ে ওঠার পরই এই অংশটা দেখা যায়। গোরা দেখল, সেখানে মুণ্ডিত মস্তক এক সন্ন্যাসীকে ঘিরে ধরেছেন কয়েকজন। তাদের হাতে উদ্যত লাঠি। সন্ন্যাসী উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। ছবিটা রঙিন। নিখুঁতভাবে আঁকা। গোরা মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'কে এই সন্ন্যাসী?'

জয়দেব বলল, 'মহাপ্রভু, বুঝতে পারছ না! মহাপ্রভুকে যখন হত্যা করা হয়, তখন খুব কাছেই ছিলেন জামিল ফেরদৌস ওরফে



গোকুলানন্দ। আসলে উনি ছিলেন নবাব হুসেন শাহর গুপ্তচর। পুরীতে ওঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রর অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধর। রাজা সে কথা অবশ্য জানতেন না। গোবিন্দ বিদ্যাধর এই জামিল ফেরদৌসকে লাগিয়ে রেখেছিলেন মহাপ্রভুর পিছনে। মহাপ্রভু যে ভণ্ড সন্ন্যাসী, সেটা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু বেশ কিছুদিন মহাপ্রভুকে নজরে রাখার পর জামিল ফেরদৌস বুঝতে পারেন, মহাপ্রভুই স্বয়ং ঈশ্বর। মুসলমান হয়েও তিনি মহাপ্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন। মহাপ্রভু যথারীতি তাঁকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর নতুন নামকরণও করেন, গোকুলানন্দ। গোবিন্দ বিদ্যাধররা এই পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র আঁচ পাননি। তাই তারা যখন খুন করার জন্য মহাপ্রভুকে ডেকে নিয়ে যান, তখন জামিল ফেরদৌসকে আটকাননি।'

'তা হলে তুমি নিশ্চিত যে, মহাপ্রভুকে খুন করা হয়েছিল।'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে। এটা একটা প্রামাণ্য দলিল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর জামিল ফেরদৌস চলে যান কেওনঝড়গড়ে। সেখানে প্রাচীন এক মন্দিরে শেষ জীবনটা কাটান।'

'কিন্তু এই একটা ছবি দেখে তুমি কী করে নিশ্চিত হলে মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছিল?'

'আমি নিশ্চিত। আমার কৌতূহল মিটে গিয়েছে। ভেবেছিলাম, এই রিসার্চ পেপার পাবলিশ করে হইচই বাঁধিয়ে দেব। কিন্তু আশ্চর্য, এখন আর আগ্রহ বোধ করছি না। জীবন সম্পর্কেই আমার আর আগ্রহ নেই। একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে পুরীতে এসেছি। আশা করি, তুমি সেই জিজ্ঞাসার উত্তর আমাকে দিতে পারবে। কিন্তু তোমার শরীরের যা অবস্থা দেখছি, তাতে প্রশ্নটা করতে ইচ্ছে করছে না।'

গোরা হেসে বলল, 'না, না। আমার কথা ভেবো না। বলো, কী তোমার প্রশ্ন?'

'পুরীতে আসার সময় ট্রেনে তোমার সঙ্গে যেদিন আমার পরিচয় হয়, সেদিন তুমি বলেছিলেন পূর্বজন্মে আমি নাকি তোমারই অনুগামী হরিদাস ছিলাম। কিন্তু তাঁর জীবনে যা ঘটেছিল, আমার জীবনে তা ঘটল না কেন? তুমি সন্দেহ করেছিলে, হরিদাসের সঙ্গে নর্তকী মাধবীর গোপন সম্পর্ক ছিল। সেই কারণে তুমি হরিদাসকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। তারপর হরিদাস আত্মহত্যা করেন। আমি কেন আত্মহত্যা করতে পারলাম না? উপাসনার বিরহ সহ্য করতে না পেরে আমিও তো আত্মহত্যাই করতে গিয়েছিলাম।'

'ঈশ্বর চাননি তাই। তুমি জানো না জয়দেব, আত্মহত্যা মহাপাপ? ঈশ্বর চাননি তুমি এই পাপের ভাগীদার হও। উনি তোমাকে দিয়ে অন্য কিছু করাতে চান। এ জগতে যা কিছু ঘটে, সবই পূর্বনির্দিষ্ট। এই যে তুমি আজ এই মুহূর্তে এখানে এসেছ, সেটাও তোমার জন্মলগ্ন থেকে ঠিক করা ছিল। উপাসনার মৃত্যু, সেটাও পূর্বনির্ধারিত ছিল। দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।'

'কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।'

'তোমার বিরহের তীব্রতা আমি অনুভব করতে পারছি জয়দেব। বিশ্বাস করো, আমিও এই মানসিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গত দু'টো দিন কাটিয়েছি। অসুস্থতার জন্য এই গম্ভীরায় আমি আটকা পড়ে আছি। প্রভু জগন্নাথকে দেখার জন্য আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে। তবুও ছুটে যেতে পারছি না। এই বিরহ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। দিনরাত হরিনাম করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছি। আমার একটা অনুরোধ রাখবে জয়দেব? আমাকে একবার জগন্নাথ মন্দিরে নিয়ে যেতে পারবে? এঁরা আমাকে যেতে দিচ্ছে না।'

জয়দেব কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ। শুনে জয়দেব তাড়াতাড়ি ছবির কাগজটা গুটিয়ে ফেলল। তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। গোরা দেখল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসী। তাঁর বয়স আন্দাজ করতে পারল না গোরা। মাথায় শ্বেতশুভ্র জটা, গোঁফ-দাড়ি। এক হাতে কমণ্ডলু, অন্য হাতে ত্রিশূল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল গোরা। করজোড়ে বলল, 'আমার প্রণাম নেবেন মহাত্মন।'

ঘরে ঢুকে পাল্টা দু'হাত জড়ো করে সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি ঋষি পরাশর। মহর্ষি বশিষ্ঠ আমার পিতামহ। বিশেষ প্রয়োজনে উনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।'

কথাটা শুনে গোরা জয়দেবের দিকে তাকাল। ওর চোখ-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। মহর্ষি বশিষ্ঠ। তিনি তো সত্যযুগের! তিনি পরাশর মুনিকে পাঠাবেন কী করে? গোরার মনে পড়ল, দেবীভাগবতে পরাশর মুনির কথা ও পড়েছে। ইনি বেদ রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা। এঁরা সবাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর পেরিয়ে কলিযুগে এখনও বেঁচে আছেন কী করে? মহর্ষি বশিষ্ঠেরই বা ওকে কী প্রয়োজন, গোরা তাও বুঝতে পারল না। জয়দেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মহাত্মন।'

পরাশর মৃদু হেসে বললেন, 'আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি প্রভু। যুগ পরিবর্তন হতে চলেছে। কলিযুগের অবসান হবে। এই সন্ধিক্ষণে আপনাকে আমাদের খুব প্রয়োজন।'

'আমাকে কোথায় যেতে হবে?'

'জাজপুর জেলায় নিয়মগিরির এক গোপন গুম্ফায়। সেখানে আপনার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করে আছেন তিন যুগ ধরে।'

নিয়মগিরির কথা গোরা শুনেছে বাবার কাছ থেকে। খুব ছোটবেলায় নাটমন্দিরে বসে বাবা সব আশ্চর্য কাহিনি বলতেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর। নিয়মগিরিতে নাকি দু'হাজার রহস্যময় গুহা আছে। এক-একটা গুহায় অসংখ্য রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে নাকি পাতালে চলে যাওয়া যায়। এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। পৃথিবীর একেবারে শেষপ্রান্তে। বাবা বলেছিলেন, ওইসব গুহায় যে কেউ ঢুকতে পারে না। গুহার ভিতর কোনও কোনও জায়গায় নাকি গাছের অদ্ভুত শিকড় পাওয়া যায়। যা বেটে চোখে লাগালে অন্ধকারেও সব কিছু দেখা যায়। দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। নিয়মগিরির কথা শুনে গোরার আরও মনে পড়ল, সেই গাছের নাম অগ্নিবলা। স্থানীয় মানুষরা অনেকেই অগ্নিবলা চূর্ণ চোখে লাগিয়ে গুহার ভিতর ঢুকেছে। পাতালে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আর ফিরে আসেনি। নিয়মগিরির একটা গুহার নাম মণিনাগ। তার ভিতর দিয়েই নাকি পাতালে প্রবেশ করা যায়। ওই গুহায় এখনও বসবাস করেন অমরত্ব পাওয়া মহামুনি আর কিছু বীর্যবান পুরুষ। অশ্বত্থামা, পরশুরাম। বাসুকি নাগও রয়েছেন।

বাবা যখন বলেছিলেন, তখন বিশ্বাস হয়নি গোরার। ধর্মান্ধ মানুষ কত কী-ই না বিশ্বাস করেন! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বাবা বলেছিলেন, বাসুকি নাগ একবার নাকি কঠিন তপস্যা করেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা হাজির হয়ে বলেন, 'তোমার কী চাই বলো।' বাসুকি তখন বলেন, 'আমি আমার দুষ্ট ভ্রাতাদের থেকে দূরে থাকতে চাই। পরলোকেও যেন তাদের সঙ্গে আমার দেখা না হয়।' ব্রহ্মা তখন বলেন, 'ঠিক আছে, তুমি তা হলে পাতালে চলে যাও। পৃথিবীকে ধারণ করো।' বাসুকি কি তা হলে ওই নিয়মগিরির গুহা দিয়েই পাতালে গিয়েছিলেন? এখনও পৃথিবী ধারণ করে আছেন তাঁর ফণায়? পুরন্দরদা তো তা হলে সেদিন সত্যি কথা বলেছিল ভূমিকম্পের পর!

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ঋষি পরাশর বললেন, 'আমার পিতামহ মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং আরও কয়েকজন আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। কিন্তু আপনার শরীরে ক্ষত রয়েছে দেখে, সেদিন চলে যান। কিন্তু আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। পর্বতচূড়ায় কোইফুল ফুটে গিয়েছে। আর দিন দুয়েকের মধ্যে পাতাল ভৈরবী হুঙ্কার ছাড়বেন। আমি দু'টো ভেষজ পদার্থ নিয়ে এসেছি। একটি বিশল্যকরণী। লাগালে আপনার পায়ের ক্ষত কিছু সময়ের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অন্যটি অগ্নিবলা, চোখে

লাগালে আপনি দিব্যদৃষ্টি পাবেন। বারো বছর আগে আপনাকে আমরা ভেষজ স্নান করিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর থেকেই আপনি অতীত অবলোকনের ক্ষমতা পান। আজ থেকে আপনি ভবিষ্যৎও দেখতে পাবেন।'

ঋষি পরাশর অদ্ভুত সব কথা বলে যাচ্ছেন। গোরা বুঝতে পারছে না। সরাসরি ও জিগ্যেস করল, 'আমাকে আপনাদের কী প্রয়োজন, তা কি জানতে পারি?'

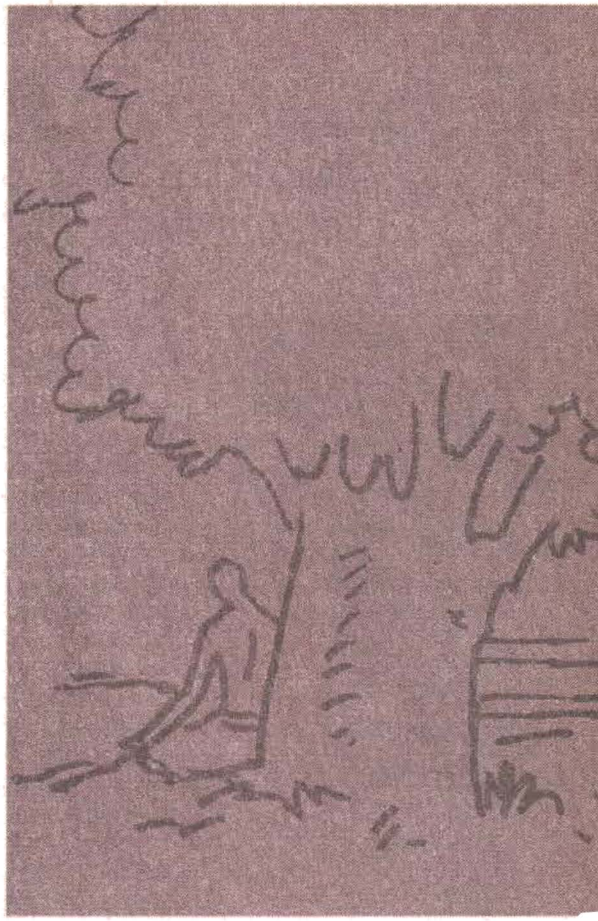
'নিয়মগিরিতে গেলেই সেটা বুঝতে পারবেন। আপনাকে যা বলার মহর্ষি বলবেন। আষাঢ়ে সপ্তমী তিথিতে আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন। আমরা পুষ্পক রথ নিয়ে হাজির হব।' কথাগুলো বলেই ঋষি পরাশর ঝোলার ভিতর থেকে মাটির দু'টো পাত্র বের করে আনলেন। পাত্র দু'টো গোরার পায়ের কাছে রেখে, তারপর হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মাটির দু'টো পাত্রের দিকে তাকিয়ে রইল গোরা। কোনটা ক্ষত নিরাময়ের জন্য বিশল্যকরণী, কোনটা দিব্যদৃষ্টির জন্য অগ্নিবলা—ও বুঝতে পারল না। এর ভিতরে রাখা একটি ভেষজ পদার্থ চোখের পাতায় লাগালে, ও নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে! কিন্তু দেখে লাভ কী? এমনিতেই ওর জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটছে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। এক বছর আগে, ইউনিভার্সিটি চত্বরে বসে ও চিন্তাই করতে পারত না, লোকে ওকে মহাপুরুষ বানিয়ে দেবে। লাখ-লাখ মানুষ ওকে দেখার জন্য ছুটে আসবে সারা দেশ থেকে। দলিতদের অধিকার আদায় করার লড়াই থেকে ও সরে এসে হরিনাম প্রচারে ব্রতী হবে। কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণ ওর চোখের সামনে ধরা দেবেন। জগন্নাথদেবের সঙ্গে ও কথা বলবে। মহর্ষি বশিষ্ঠ ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হবেন। গোরা বিশ্বাস করার চেষ্টা করল, সত্যিই কি ঋষি পরাশর ওর সঙ্গে কথা বলে গেলেন? সত্যিই কি তিনি পুষ্পক রথ নিয়ে হাজির হবেন? অ্যাবসার্ড!

বসে থাকার সময়ই ও টের পেল, শরীরের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। একবার স্নান করে নিলে হয়তো শরীরের তাপ কমতে পারে। কিন্তু উঠে গিয়ে স্নানঘরে ঢোকার শক্তি ওর অবশিষ্ট নেই। পা ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে, ক্ষতস্থান থেকে রস বেরোচ্ছে। টুবাই কাল রাতে ডাক্তার ডেকে এনেছিল। ক্ষত দেখে উনি ইঞ্জেকশন দিতে চাইছিলেন। কিন্তু শরীরে সূচ ফোটানোর কথা ভাবলেই আঁতকে ওঠে গোরা। ছোটবেলা থেকেই ওর ভীষণ ভয়। কিছুতেই ও ইঞ্জেকশন নিতে রাজি হয়নি। ডাক্তার তখন বললেন, 'তা হলে আমার নার্সিংহোমে নিয়ে চলুন। আমার ভয় হচ্ছে, প্রভুর পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যেতে পারে। তখন কিন্তু অ্যামপিউট করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।'

কথাটা মনে পড়ায় গোরা চোখ বুজল। ওর কপালের পাশটা টিপটিপ করতে লাগল। মাথার ভিতরে একটা লাল বৃত্ত ঘুরতে লাগল। সেটা স্থির হওয়ার পর গোরা দেখতে পেল, এক বিশাল বনাঞ্চলের মধ্যে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিকটেই উত্তাল সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে ও দেখতে পেল, বিরাট একটা শাল্মলি বৃক্ষের তলায় পদ্মাসনে বসে আছেন মহাবলী এক পুরুষ। দেখেই গোরা বুঝতে পারল, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সহোদর বলরাম। দূর থেকে প্রণাম করার পর ও যা দেখল, তাতে ওর সারা শরীরের রোম শিহরিত হয়ে উঠল। গোরা দেখল, বলরামের মুখ থেকে শ্বেতবর্ণ, সহস্রশীর্ষ, রক্তমুখ এক মহানাগ বেরিয়ে আসছে। সেই নাগ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক—অনেকেই উঠে এসেছেন। মহানাগ সমুদ্রে প্রবেশ করার পরই বলরামের দেহ অন্তর্হিত হয়ে গেল।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোরা, ওর সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। একটা সময় মন্ত্রমুগ্ধের মতো ও এগিয়ে গেল। বলরাম যেখানে বসেছিলেন, সেখানে গিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে শুয়ে পড়ল। গোরার মনে হল, ওরও অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। শুয়ে থাকার সময়ই ও হঠাৎ অনুভব করল, ওর পায়ের তলায় কী যেন এসে



ফুটল। একটা তীব্র ব্যথা পা থেকে ওর মাথায় পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। পায়ের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, ও বাণসিদ্ধ হয়েছে। একটু পরেই এক ব্যাধ কাঁদতে-কাঁদতে ওর পায়ের সামনে আছড়ে পড়ে বলল, 'প্রভু, আমি জরা। দূর থেকে মৃগ ভেবে আপনার দিকে শর নিক্ষেপ করেছিলাম। না জেনে ঘোর পাপ করে ফেললাম। নরকেও আমার ঠাঁই হবে না।'

গোরা বলল, 'তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার হাতেই যে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হবে, এটা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। তুমি নিমিত্ত মাত্র। দাঁড়াও, তোমাকে আমি স্বর্গলোকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

...পায়ের তলা থেকে ব্যথাটা ধীরে-ধীরে ফের উঠে আসছে। গোরা উঠে বসার চেষ্টা করল। চোখ মেলে ও দেখল, টুবাই ও জয়দেব সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথায় সেই বনাঞ্চল? নিমেষে সব মিলিয়ে গিয়েছে। ও গম্ভীরাতেই শুয়ে আছে। টুবাই ওকে বলল, 'প্রভু, জয়দেব এসেছে।'

গোরা বলল, 'হ্যাঁ, একটু আগেই ও আমার সঙ্গে কথা বলছিল। ঋষি পরাশর এসেছিলেন বলে...ওকে বাইরে যেতে বলেছিলাম।'

'কে ঋষি পরাশর, প্রভু? কেউ তো আসেননি। জয়দেবও আপনার ঘরে ঢোকেনি।'

কী বলছে টুবাই। গোরার সব গুলিয়ে গেল। ও বোঝার চেষ্টা করল, জ্বরের প্রকোপে ও কি এতক্ষণ অলীক দর্শন করছিল? ইংরেজিতে যাকে বলে হ্যালুসিনেশন?

পরের এপিসোড আগামী রোববার

অলংকরণ : শান্তনু দে

এমন একটা ছেলের কেউ কোথাও নেই শুনে, মা খুব কাঁদলেন। শাড়ির আঁচল দিয়ে জ্যাঠাইমা চোখ মোছালেন। দুর্গার মা মনের দুঃখে বঁটিতে আঙুল কেটে ফেললেন।



ছোট্ট পাড়ার ছোট্ট মিষ্টির দোকান, কিন্তু খুব নাম—'পরেশের দোকান'। সন্দেশ, রসগোল্লা, দই আর রাবড়ি। হায়, হায়! কী স্বাদ! জামাইষষ্ঠীর জামাইরা বলেন, এই পাড়ার মেয়েরা একটা কারণে ভরে যাবে—পরেশদার দই, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা। পোঁ পোঁ সানাই। পরেশদার চেহারাটাও খুব মিষ্টি। ফরসা, গোলগাল, কালো কুচকুচে চুল। ঢলঢলে চোখ। বাতাবি লেবুর মতো একটা ভুঁড়ি। নরমপাক সন্দেশের মতো নরম একটা মানুষ। কথা খুব কম বলেন। ভোর থেকে রাত একটা পর্যন্ত কাজ আর কাজ। রাত দু'টোর সময় দোকানের সামনে চওড়া একটা বেঞ্চিতে ছাই মেখে মহাদেবের মতো শুয়ে থাকেন। ছাই মাখলে মশা কামড়াবে না। দোকানের ভেতরে দেওয়ালে দেওয়ালে ময়ূরপুচ্ছ। টিকটিকি উৎপাত করবে না।

পরেশদার দোকানে কাজ করতে এল হুগলি জেলার রাজু। তার কেউ নেই। সেই ছেলেবেলা থেকে নিজেকেই নিজে বাঁচিয়ে রেখেছে। খাড়া একটা নাক। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। ফরসা রং। সোজা, খাড়া চেহারা। ম্যান্ডোলিন বাজাতে পারে। গান লেখে। ঠাকুর-দেবতার গান। পাথার পিঠে চড়তে পারে। খুব ভাল আলুর দম রাঁধে। পোড়া কয়লা দিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে। নিরঞ্জনদার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। দু'জনে আমাদের পুকুরে জেলপাড় সাঁতার কাটে।

এমন একটা ছেলের কেউ কোথাও নেই শুনে, মা খুব কাঁদলেন। শাড়ির আঁচল দিয়ে জ্যাঠাইমা চোখ মোছালেন। দুর্গার মা মনের দুঃখে বঁটিতে আঙুল কেটে ফেললেন। নিরঞ্জনদা তুলো আর আয়োডিন নিয়ে তাড়া করলেন। আমাদের পুষির ঘুম ভেঙে গেল। হাই তুলে, আড়ামোড়া ভেঙে আবার শুয়ে পড়ল। দৌড়বার সুযোগ এলে মা-কে কে ধরে রাখবে! তিনিও হরবর- দরবর করে ছুটলেন দুর্গার মা-কে ধরতে। বড়মা বললেন, 'কাকে কী বলব?'

দুপুরবেলা মিটিং বসল। বিশেষ সভা। নিরঞ্জনদা বেশ ভব্য হয়ে একটু দূরে বসেছেন। মা আর জ্যাঠাইমা পাশাপাশি। আমাদের বামুনদি চোখ বুজিয়ে পান একসঙ্গে দু'টো খিলি মুখে পুরেছে। দুলে দুলে পান খায় খুব আয়েশ করে। নিরঞ্জনদা বললেন, 'রাজুর বিয়ে দেবো।'

ব্যস, হয়ে গেল। মা চনমন করে উঠলেন—'কবে কবে?'

কোথাও কারও বিয়ে হলে মায়ের কী আনন্দ—'উঃ, সানাই, সানাই! চলো না দিদি, একবার ঘুরে আসি।'

'তোকে কেউ নেমন্তন্ন করেছে?'

'নাই বা করল। আমরা বাইরে থেকে দেখে আসব। কত লোকজন, শাঁখ, উলু, গায়ে হলুদ, ঝাঁ-কনকনে [illegible]। ধাঁই ধাঁই মশলা গুঁড়ো। ফিরে ভাজার গন্ধ। সার দিয়ে তত্ত্ব আসছে, তেল-হলুদ মাখানো আস্ত রুই মাছ।'

নিরঞ্জনদা বললেন, 'পাত্রী আমার খুব পছন্দের। রাজুর পাশে খুব মানাবে।'

'কে সে?' বড়মা দু'দাঁতের মাঝখানে একটা লবঙ্গ ধরে জিগ্যেস করলেন।

'আমি নামটা বলছি। যা করার আপনারা করবেন। মেয়ের নাম দুর্গা।'

মা বসে বসেই খানিক নেচে নিলেন, 'লাল বেনারসি পরাব, কপালে টিকলি ঝোলাব।'

বড়মা মায়ের চুলে এক টান মেরে বললেন, 'চুপ কর পাগলি। হাজার কথা না হলে বিয়ের কথা পাকা হয় না। দুর্গা খুব ভাল মেয়ে, লেখাপড়াতেও ভাল, অনেক রকম হাতের কাজ শিখেছে, ভাল গান করে, ওর মা-কে বলেছ?'

'আমি কী বলব? আপনারাই তো সব। আপনারাই তো রাজুর মা। ত্রিভুবনে ওর আর কে আছে।'

এই সময় দুর্গার মা ঘরে ঢুকল। নাকের ডগায় খানিকটা চুন। 'কী করে এলে? মারামারি?'

'মারামারি নয়, আমাদের পুষির বড়মেয়ে আদর করে কামড়ে দিয়েছে। কচি কচি দাঁতে।' বড়মা বললেন, 'বোসো। মেয়ের বিয়ে দেবে? আমরা ভাল পাত্র ঠিক করেছি।'

'সে তোমরা যা করবে। গরিবের মেয়ে।'

'পাত্র হল রাজু। কী, তোমার মত আছে তো?'

'বাবা, সে যে সোনার চাঁদ! গরিবের মেয়েকে সে বিয়ে করবে কেন?'

'সে আমরা বুঝব। তোমার দুর্গার মত আছে কি না দেখতে হবে।'

'ও বাবা! দুর্গা সেদিন বলছিল, মা ছেলেটা কী সুন্দর! যেন রাজপুত্তুর।'

'আমরা আশীর্বাদ করতে যাব।'

মা বললেন, 'আজই চলো না।' বড়মার টানে মায়ের খোঁপা ভেঙে পড়ল।


ON THE SIDELINE
ON A ROLL
ON THE COVER
SEAGRAM'S
ROYAL
STAG
MEGA
MUSIC
IT'S YOUR LIFE. MAKE IT LARGE.
Music CDs